বোবা প্রশ্ন

মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

বোবা প্রশ্ন

(উপন্যাস)

মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

বাংলাদেশ কো-আপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

বোবা প্রশ্ন

(উপন্যাস)

মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

প্রকাশকঃ
ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ঢাকা অফিসঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
নভেম্বর ১৯৯৭

কভার ডিজাইনঃ
অহিদ চৌধুরী

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণঃ
আইডিয়াস
আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬২১৭৭৬
মূল্যঃ ৭৫.০০ টাকা

Boba Prashna by Md. Shamsuzzoha
Published by Engr. Munawwar Ahmad
Chairman, Bangladesh Co-operativ Book Society Ltd.
Chittagong, Dhaka.

Tk. 75.00
$ 2.00
ISBN 984-493-024-3

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলীর কথা দিয়েই শুরু করছি আমার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য। "মানুষ অনেক সময়েই নিজের শক্তি, নিজের ক্ষমতার খবর রাখে না। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়ের পক্ষেই একথা খাটে। প্রচণ্ড ধাক্কায়, আকস্মিক আঘাতে কখনো কখনো এই আত্মবিস্মৃতির, এই আত্ম ঔদাসীন্যের অবসান ঘটে। তখন তার অন্তর্নিহিত শক্তির আকস্মিক উৎসারে অন্যেরাই শুধু বিস্মিত হয় না, সে ব্যক্তি বা জাতি নিজেও অবাক হয়। সংকটের সন্ধিক্ষণে এমনিতরো এক একটি দুর্লভ মুহূর্তে তার আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন লোকচক্ষুর আড়ালে অদৃশ্য তার জীবনোৎস থেকে সহসা উৎক্ষিপ্ত ফোয়ারা দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে আর সেই ব্যক্তি বা জাতি বুঝতে পারে তার সত্তার বুনিয়াদ কি, তার জীবনের পুঁজি কি, তার শক্তি ও ক্ষমতা কোথায়।"

পেশাগত জীবনে ব্যক্তি মুহম্মদ শামসুজ্জোহা একজন আইনজীবী। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। পাকিস্তান আমল থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে এসেছেন। পাকিস্তান যুগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক "মোহাম্মদী," "মাহে নও", "দিলরুবা" "এলো মেলো", "সাপ্তাহিক সৈনিক", "চিত্রাকাশ" প্রভৃতি সাময়িকী এবং দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক নাজাত, দৈনিক ইত্তেহাদ ইত্যাদির সাহিত্য বিভাগে তিনি নিয়মিত একাংকিকা, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তীকালে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকার দরুণ বেশ কিছুদিন সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে ছিলেন তিনি। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন লেখক তাঁর বাসভূমি চট্টগ্রাম শহরের বুকেই অবস্থান করছিলেন। তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের পরিস্থিতি। নিকট থেকে বহুকিছু তিনি দেখেছেন যার মধ্যে আতিশয্য নেই, নেই অতিরঞ্জন। আমি নিশ্চিত, তিনি কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দেখেন নি, দেখেছেন একজন নিরপেক্ষ মানুষ হিসাবে। তাঁর দৃষ্টির ক্যামেরায় যেসব দৃশ্য ধরা পড়েছে সেসবই তিনি সহজ সরল ভাষায় রূপ দিয়েছেন তাঁর এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসের পটভূমি সম্পূর্ণ বাস্তব বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কাল্পনিক হলেও তথ্যবিবর্জিত নয়। বিদগ্ধ পাঠককুল এ পুস্তক থেকে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। মুক্তিযুদ্ধের ওপর

বহু উপন্যাস, বহু গল্প, বহু নাটক, বহু স্মৃতি কথা ইতিমধ্যেই রচিত হয়ে গেছে। সে সবের লেখকগণ কোন না কোন পক্ষাবলম্বন করেছেন বলে আমার ধারণা। এ উপন্যাসের লেখক কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এতেই তাঁর লেখাটি অনবদ্য হয়েছে। লেখক নিজেই বলেন যে, তিনি কি লিখতে কি লিখেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য বা পক্ষপাতিত্ব নেই। এরা সব বাংলাদেশের শতকরা নব্বইভাগ সাধারণ মানুষেরই প্রতিনিধি। আমাদের নতুন প্রজন্ম এই বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। তারা এই বইটিতে চিত্রিত বিভিন্ন ধরণের দৃশ্য থেকেও তাদের অনুসন্ধিৎসু মনের বহু প্রশ্নের জবাব পাবে। ইতিহাসবেত্তাগণ পাবেন এদেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার সময় গবেষণার জন্য বহু মালমসলা ও না-বলা সত্যের আভাস ইঙ্গিত।

এ উপলক্ষে পাঠকবৃন্দকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বর্তমানে নূতন প্রকাশনায় এবং শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন প্রকল্পে হাত দিতে যাচ্ছে।

মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

লেখকের কিছু প্রাকভাষ্য

'বোবা প্রশ্ন' উপন্যাসখানা পুস্তকাকারে প্রকাশিত আমার প্রথম বই। ইতিপূর্বে ঢাকা-চট্টগ্রামের বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকীর সাহিত্য বিভাগে আমার বেশ কিছু গল্প, একাংকিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ আমার হয়নি। অর্থনৈতিক কারণটাই প্রধান অন্তরায় ছিল। পরবর্তীকালে আমার সেসব লেখা কোথায় যে হারিয়ে গেল তার আর কোন হদিসই পেলাম না। পাণ্ডুলিপিগুলোও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমার সেসব সাহিত্যকীর্তি আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। পাকিস্তান আমলে ছাত্রাবস্থাতেই আমি বিশেষ করে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়েছিলাম। পরবর্তীতে জীবনের চলার পথের বাঁকে বাঁকে এবং তার আবর্তে পড়ে লেখালেখি থেকে বেশ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সাহিত্যের নেশা ত্যাগ করতে পারিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চট্টগ্রাম থেকেই শুরু হয়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম ঘোষিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা। সেসময় চট্টগ্রামের যে টালমাটাল অবস্থা আমি দেখেছি তা-ই আমাকে কলম ধরতে আমার ভেতরকার সুপ্ত পাগল মনটাকে আবার উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমার আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি সেদিনের সেই কলম ধরারই পূর্ণপরিণতি বা পরিপূর্ণ ফসল। এটি লিখে দীর্ঘ দিন ফেলে রেখেছিলাম। প্রকাশের সুযোগ পাইনি, কিংবা চেষ্টাও করিনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন আমার বাল্যবন্ধু বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্কৃতিবিদ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির সভাপতি সাহিত্যামোদী ইঞ্জিনীয়ার মুনাওয়ার আহমদ তাঁদের কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির মাধ্যমে আমার এই বইটি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি সানন্দে সম্মত হয়ে গেলাম। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমার এই উপন্যাসখানা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পেতো কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পরিচালকবৃন্দের কাছে আমি এই বই প্রকাশ করার জন্য ঋণী। বিশেষভাবে অন্যতম পরিচালক প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিদ ও সমাজসেবী আমার আরেক বিশিষ্ট বন্ধু জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহর সক্রিয় সহযোগিতা আমার এই বইটিকে উপন্যাসাকারে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ ও কবি জহুর-উশ-শহীদ আমার এই বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরিতে ও প্রুফের ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বলে আমি তাঁদের কাছেও ঋণী। জানি না আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সুধী পাঠকমহলে কতটুকু সমাদৃত হবে। এখানে পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভাল যে, আমি রাজনীতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এসবের কিছুই নই। আমি সাধারণ একজন নগণ্য মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে চলতে গিয়ে যা কিছু চোখে পড়েছে তার বাংময় প্রকাশই হচ্ছে আমার এই উপন্যাসখানা। এই উপন্যাস রচনার পেছনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কাজ করেনি। এটি শুধু একজন পথচারীর বিক্ষিপ্ত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

মুহম্মদ শামসুজ্জোহা
হাজী আবদুল হামিদ সওদাগর রোড
শুলক বহর, পাঁচলাইশ
চট্টগ্রাম।

বোবা প্রশ্ন

এক

রাতের নিকষকালো অন্ধকার আচমকা যেন কেঁপে ওঠল। ভেঙে গেল রাতের সাঁড়াশি ঘুমের বাঁধন। তবুও যেন চোখ খুলতে চায় না রাহাতের। তেমনি শুয়ে থাকে রাহাত খাটের ওপর নির্জীবের মত। এক দুই তিন করে কেটে যায় অনেকগুলো মুহূর্ত। না, এভাবে তো আর শুয়ে থাকলে তার চলবে না। তার ডিউটি আছে। চাকরির ডিউটি। পাঁচটার পূর্বে তাকে মিলে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে। শত শত শ্রমিক কর্মচারী তার পথপানে চেয়ে থাকবে। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে না পারলে কোম্পানীর বেশুমার ক্ষতি। কি জবাব দেবে তখন সে কোম্পানীকে। সে না কোম্পানীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী! না, আর না। চোখ কচলে ঘুমের আমেজ জড়ানো চোখে তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখে সে। চারটা। ভোর হতে এখনো এক ঘন্টা বাকী। বিশ তিরিশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে তাকে রওনা হতেই হবে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়ে রাহাত।

ঃ কে? তুমি ওঠেছ?

ঃ হ্যাঁ, চারটা বেজে গেছে।

সামিনার কথার জবাব দেয় রাহাত। আঁখি কি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তার মা সামিনার পাশে! রাহাত-সামিনার দাম্পত্য জীবনের সেতুবন্ধন এই আঁখি। প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে নেয় রাহাত। বিজলি বাতির আলোতে ঘুমন্ত আঁখির মাসুম চেহারার দিকে একবার তাকায় মশারির ভেতর দিয়ে। ইচ্ছে করে ছোট্ট একটি চুমু খেতে। কিন্তু না, যদি জেগে যায়। তখন ওকে সামলানো কঠিন হবে।

ঘর থেকে বের হয় রাহাত। জনমানবহীন পথ ধরে এগুতে থাকে। এখানে ওখানে, দূরে কাছে, অনেক বিজলি বাতি জ্বলছে। তারই আবছা আবছা আলো আধাঁরিতে ঘেরা চারদিককে মনে হচ্ছিল তখন গা ছম ছম করা এক অচিন পুরী। মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শেষ রাতের নীরবতা ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। এখনো রাত শেষ হতে প্রায় আধ ঘন্টার মত বাকী। কোন লোকজন নেই রাস্তায়। একা পথ চলছে রাহাত। অভ্যাস হয়ে গেছে

রাহাতের। আজ চার পাঁচ বছর ধরে সপ্তাহ পর পর সে মিলে ডিউটি করে আসছে এমনি করে। ভয় বা বিরক্তি কোনটাই পারেনি তার পথ রোধ করতে। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে সে পেরিয়ে এসেছে অনেক পথ। ষোলশহর এক নম্বর গেট ঘরের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়ায় রাহাত। রেলপথ পার হয়ে যাচ্ছে এরা কারা? দলবদ্ধ সামরিক পোশাক পরিহিত? আরো কাছে এগিয়ে যায় রাহাত। হ্যাঁ, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিকরা দলবদ্ধ হয়ে কোথায় যাচ্ছে?

ঃ রাজনীতি ফাজনীতি বুঝি না। আঘাত হানলে প্রত্যাঘাত হানব।

জনৈক সিপাহীর কণ্ঠে উচ্চারিত উপরোক্ত বাক্যটি শুনতে পেল রাহাত। ওরা চলে যাওয়ার পর দশ মিনিটের মধ্যে মিলে গিয়ে পৌঁছায় সে। গেটে দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ড সালাম ঠুকল তাকে। সুবেহ্ সাদেক হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত ভোরের আজান ভেসে আসছে কর্ণকুহরে। ছাব্বিশে মার্চ, উনিশ শ একাত্তর সাল, শুক্রবার।

ঃ আজকে মিল চলবে না, স্যার।

শ্রমিক নেতা ইউসুফ কাছে এসে দাঁড়াল রাহাতের। নূরুল আমিন, দীন মুহম্মদ, সিরাজ প্রমুখ শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে শ্রমিকেরা মিলের সিকিউরিটি গার্ডদের বন্দুকগুলো এক এক করে কেড়ে নিচ্ছে।

ঃ এসব কি হচ্ছে, ইউসুফ?

ঃ কেন, আপনি কিছুই জানেন না, স্যার?

ঃ না তো।

ঃ সারা রাত ধরে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙ্গালী সিপাহীদের লড়াই হয়েছে ষোলশহরে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা অস্ত্র বোঝাই ষ্টিমার থেকে মাল আনলোড করতে বাঙ্গালী শ্রমিকেরা অস্বীকৃতি জানালে সংঘর্ষ বেঁধে যায় মিলিটারীদের সঙ্গে। বাঙ্গালীরা এখন রাস্তায় রাস্তায় ব্লকেড দিয়েছে। তাছাড়া-।

ঃ ঢাকায়ও গতরাতে সাংঘাতিক গোলাগুলি হয়েছে। শেখ সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। রাজার বাগ পুলিশ লাইনে পাঞ্জাবীদের আক্রমণে বহু লোক হতাহত হয়েছে।

ইউসুফের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই বলে বসল সিরাজ। ---- চারদিকে কেমন যেন একটা সাজ সাজ রব। অস্ত্র জোগাড় কর। বেরিয়ে পড়। যার যা আছে তা নিয়ে চল যুদ্ধে। --- অবাঙ্গালীরা ভয়ে তটস্থ। খোলা ট্রাক ও জীপে করে বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তরুণেরা টহলে বেরিয়েছে চট্টগ্রাম শহরের রাস্তায় রাস্তায়। পুলিশ, আনসার, রাইফেলস সবাই বেরিয়ে এসেছে। ঘর বাড়ী দোকানপাট, অফিস আদালত সবগুলোর শীর্ষে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত লালবৃত্ত সম্বলিত সবুজ পতাকা। অফিস আদালত মিল ফ্যাক্টরী সব বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র শুধু সাজ সাজ রব। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কোথাও অবাঙ্গালীদের কোন টিকি পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাংলা ভাষাভাষী প্রায় প্রতিটি মানুষের মনের বাসনা একটিই। না, আর নয়। পূর্ব পাকিস্তানকে আর কলোনী বানিয়ে রাখতে দেয়া যায় না পশ্চিম পাকিস্তানীদের। স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে এবার বাঁচবে বাঙ্গালীরা।

বাসায় ফিরে আসল রাহাত। সামিনাকে কিছুই বলতে পারল না। বলতে হলও না। এর মধ্যে সে সব শুনে গেছে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে। রেডিও অন করে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করল রাহাত। না, কোন ষ্টেশনই খোলা নেই। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব চতুর্দিকে। কি হতে যাচ্ছে সমগ্র দেশে কেউ জানে না। সবার চোখে মুখে একটা করুণ জিজ্ঞাসা-সত্যিই কি দেশ স্বাধীন হবে? সত্যিই কি তাহলে আপন স্বাতন্ত্র্যে মন্ডিত হয়ে বাঙ্গালীরা একটি জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে! শোভা পাবে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ! নির্বাক প্রশ্ন প্রতিটি বাঙ্গালীর মানস-সিন্ধুতে হিন্দোল জাগিয়ে চলেছে গোপনে গোপনে। তরুণ তরুণীরা উচ্ছল। আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের। তারা জেগেছে। পাঞ্জাবীদের রাজত্ব আর নয়।

রাহাত ও সামিনা তাকায় অবাক দৃষ্টিতে আঁখির দিকে। মাসুম শিশু আঁখি। কিছুই বুঝে না, কিছুই সুজে না। চার মাসের বাচ্চা আঁখি। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বাপমার দিকে। বিস্ফারিত চোখের চাউনিতে যেন তার অগণন প্রশ্ন। কোন দেশে জন্ম নিল সে। কি তার ভবিষ্যৎ। কি তার লক্ষ্য। বিছানায় শায়িত নিথর নিস্তব্ধ আঁখির প্রশ্নাতুর চোখের মণির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

ভরে রাহাত সামিনা। রাহাত চুমু খায় আঁখিকে। আদর করে। আলতো হাসির ছটা খেলে যায় আঁখির গোলাপী ঠোঁটে। পুতুলের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু আঁখি। সামিনা কোলে তুলে নেয় আঁখিকে। বুকের দুধ দেয়। ওর মতই হয়েছে আঁখি। সামিনার মা বলেন-

ঃ দেখিস, আমার নাতনী কিন্তু যেমনি সুন্দরী হবে তেমনি বুদ্ধিমতীও হবে।

সত্যিই কি তাই! ভাবে সামিনা। সামিনার বুকের দুধে হয় না আঁখির। তোলা দুধও খাওয়াতে হয়। কে জানে কি করে মানুষ করবে আঁখিকে। দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সবখানে অরাজকতা। কোথাও কোন শান্তি শৃঙ্খলা নেই। মাসের শেষ। রাহাত বেতনও পায়নি। বিশ তিরিশ টাকা যা ঘরে আছে তা দিয়ে কোনরূপে সংসার চালানোও কঠিন হবে। আঁখির দুধের টিনও খালি হয়ে গেছে। দুধও কিনতে হবে। দেশের যা অবস্থা! কবে যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে কে জানে। চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও ফুরিয়ে আসছে। আর দু'চারদিন পর বেতন পেলে রাহাত এসব জিনিস কিনে আনত। এখন সব অনিশ্চিত। আজিজ এসে মাঝে মাঝে খবরাখবর নেয় সামিনাদের। সামিনার মেজ মিয়া ভাই। আম বাগানের ওদিকে থাকে রেলওয়ে কোয়ার্টারে। আশে পাশে সব অবাঙ্গালী বিহারীদের বসতি। ওদের সঙ্গে মিশে গেছে আজিজ। কথাবার্তায় আচার আচরণে ওদের সঙ্গে আজিজেরও বেশ বনিবনা। রাজনীতির ধারে কাছে নেই তাদের কেউ। সবাই ব্যস্ত যার যার জীবন নিয়ে। কিন্তু তথাপি সেখানে গিয়েও আঘাত হানে স্বাধীনতা যুদ্ধের তীব্রতরঙ্গ। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বিহারীরা। কি হবে তাদের? কোথায় যাবে তারা?

ঃ আমাদের কি অবস্থা হবে, আজিজ মিয়া?

ঃ কেন, কি অবস্থা হবে আবার! আপনারা আমাদের মতই থাকবেন আমাদের এখানে। এদেশের বাসিন্দা হয়ে।

ঃ আমরাও তো তাই চাই। কিন্তু আমরা যে মোহাজের। বিহারী।

চরম অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে মোকাররম সাহেবের কণ্ঠে। আজিজের শত আশ্বাসবাণীতেও ভয়ের কালো মেঘ অপসৃত হয় না মনের আকাশ থেকে।

ঃ সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে ভারত থেকে আমরা এদেশে এসেছি আশ্রয়ের আশায়।

ঃ আপনাদের তো কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছে না এদেশ থেকে। আপনারা এদেশের গণমানুষের সঙ্গে মিশে যান। দেখবেন, সবাই আপনাদেরও ভালবাসবে।

একজনের আশ্বাসে তো আর আশ্বস্ত হওয়া যায় না। একদিন একদল হুজুগী জনতা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সত্যি সত্যি লাঠিসোটা দা ছুরি ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমবাগানের বিহারী মহল্লায় হামলা চালিয়ে বিহারীদের ঘর বাড়ী দরজা জানালা ভেঙ্গে মালামাল আসবাবপত্র ইত্যাদি লুঠতরাজ করে নিয়ে যায়। তবে বিহারীরা ইতিপূর্বেই ঘরে ঘরে তালা ঝুলিয়ে যে যেদিকে পেরেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে গেছে। ভীষণ ভয় হল আজিজের। সেও তার ঘরে তালা ঝুলিয়ে সামিনাদের এখানে এসে ওঠেছে। একা আর সেখানে পড়ে থাকতে সাহস হল না। অনেকেই দেশের গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছে। আজিজের পক্ষে দেশের বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব নয়। সুদূর উত্তর বঙ্গের ঈশ্বরদি শহরে আজিজদের বাড়ী। মা বাপ ভাই বোন সব ওখানে আছে। নিজের পোয়াতী স্ত্রীকেও মাস খানেক আগে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ীতে বাপ মার কাছে। এখানে একমাত্র বোন সামিনাই আছে তার সংসার নিয়ে। সামিনার বিয়ে হয়েছে চট্টগ্রামের ছেলে রাহাতের সাথে। খুব ভাল লাগে আজিজের রাহাতকে। নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। শহরের প্রত্যন্তে পৈতৃক ভিটেয় একটি ছোট্ট বাড়ী করে সামিনা আর আঁখিকে নিয়ে তার বসবাস। আড়ম্বর নেই, জাঁকজমক নেই। নেই কোন প্রাচুর্যের দাপট। রাণী ভাবীকে নিয়ে আজিজ যখনই সময় পেয়েছে ছুটে এসেছে সামিনাদের এখানে।

ঃ রাহাত ভাইয়ের মত মানুষই হয় না।

আজিজপত্নী রাণীর মন্তব্যের মধ্যে এতটুকু আতিশয্য নেই। অন্ততঃ পক্ষে আজিজেরও তাই ধারণা। হোক না জুট মিলের উইভিং ডিপার্টমেন্টের সামান্য একজন অফিসার। শিফ্‌ট ইনচার্জ। মিল ফ্যাক্টরীর অফিসারেরা সাধারণতঃ এত জনপ্রিয় হয় না। অথচ রাহাতকে ভালবাসে শ্রমিকেরা প্রাণ দিয়ে। রাহাত যেন তাদের কাছে আকাশের চাঁদ।

ঃ আমার পলিসি হচ্ছে কো-অপারেশন, কোয়েরশন নয়। শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করব ভালবাসা দিয়ে। ভীতি প্রদর্শন করে নয়।

এই নীতিই রাহাতকে জনপ্রিয় করে তুলেছে সমগ্র মিল এলাকায়। তিন চারটি মিল নিয়ে এই মিল এলাকাটি। আমিন প্রজেক্টের প্রথম মিল ছিল এক নম্বর মিল। ন্যারো বা ছোট ছোট তাঁত বসিয়ে শুরু করেছিল পাট থেকে চট তৈরির কাজ। ব্যাচিং, বিমিং, উইভিং, ফিনিশিং প্রভৃতি ডিপার্টমেন্টে তিন শিফ্‌টে শত শত শ্রমিক দিনে রাতে কাজ করে উন্নতির শিখরে নিয়ে গিয়েছিল মিলটিকে। এক নম্বর মিলের শ্রমিকদের একাগ্রতা ও কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন দৃষ্টে কোম্পানী ষ্টার্ট দিলেন মিলের ব্রডলুম বা বড় তাঁতের দুই নম্বর মিল। তারপর তিন নম্বর মিল। অতঃপর কার্পেট। এমনি করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী কোম্পানীর আমিন প্রকল্প গড়ে ওঠেছিল চট্টগ্রামের ষোলশহর এলাকায় সবুজ বনানী ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চলে। এদিকে পাহাড়, ওদিকে পাহাড়। সবুজিমার অপূর্ব সমারোহ। এসব পাহাড়েরই পাদদেশে ছবির মত গড়ে ওঠেছে আমিন প্রকল্পের মিলগুলো। পার্শ্বদিয়ে চলে গেছে রেলপথ। সেই রেলপথ মিল এলাকার ভেতর দিয়ে শহর ছাড়িয়ে গ্রামের খালবিল বন বিটপীর ফাঁক দিয়ে কত দূর দূরান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশরা যখন জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমান্বয়ে পশ্চাদপসরণ করতে করতে চট্টগ্রামে এসে ঠেকেছিল তখন চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকাগুলোই দিয়েছিল তাদের রুখে দাঁড়াবার শেষ আশ্রয়। তখন উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের শেষ এবং পঁয়তাল্লিশ সালের শুরু। বার্মার রেঙ্গুন বুচিডং মংডু ইত্যাদি শহর বৃটিশের হাতছাড়া হয়ে একের পর এক জাপানের দখলে চলে যাওয়ার পর বৃটিশরা এসে চট্টলার টিলা পাহাড়ের পাদদেশ ও মালভূমিতে আস্তানা গাড়ে। তখন এই আমিন প্রকল্পটির এলাকাতেও বৃটিশ গোরা সৈনিকদের এক বিরাট আস্তানা গড়ে ওঠেছিল।

ঃ তখন এই এলাকাতে কোন লোক বসতি ছিল না। মিউনিসিপালিটি ছিল চকবাজার পর্যন্ত। এখানে ছিল খয়রাতী মিঞার বিরাট লিচু বাগান। চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। লিচু বাগানের মধ্যেই গোরা সাহেবদের ক্যাম্প।

বৃটিশ আমলের প্রবীণদের স্মৃতি রোমন্থন করতে রাহাতরা শুনেছে। গোরা সাহেবদের ক্যাম্পের অদূরে কাঁচা রাস্তার ধারে এক খোঁড়া ভিক্ষুক কাঠের নির্মিত বাক্সের গাড়ীতে বসে ভিক্ষা করত একটি কুঁড়ে ঘরের বারান্দায়। পথচারীরা তাকে দুচার পয়সা ভিক্ষা দিত। এমনকি সৈনিক সাহেবরাও। ভিক্ষুকটির ঘরের পাশেই এক বিরাট গুদাম তৈরি করেছিল সৈনিকরা। অস্ত্রের গোলা বারুদের গুদাম। এটির নাম ছিল ডিপো। সেই থেকে এই এলাকাটি আঁতুরার (খোঁড়ার) ডিপো নামেই পরিচিত হয়ে যায়। আঁতুরার ডিপো থেকে কয়েকশ গজ দূরে কসাই পাড়া। কসাইপাড়ার কসাইরা চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র গরু জবাই করে করে গোশত বিক্রি করত। বাছাই করা গরুর গোশত বিক্রির জন্য বিখ্যাত ছিল এতদঞ্চলের কসাইরা। বহদ্দার হাট ও বিবির হাটের গোশত না হলে মেহমানদারী পর্যন্ত ফিকে হয়ে যেত। সুদূর বিলাত আমেরিকার গোরা সৈন্যরা পর্যন্ত কসাইপাড়ার কসাইদের গোশত খেয়ে তারিফ করেছে।

কিন্তু সেই কসাই পাড়াতেও একদিন আগুন লেগেছিল। হ্যাঁ, আগুন। ভয়ংকর আগুন। সেকি আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলেছিল একের পর এক ঘর। কুঁড়ে ঘর, টিনের ঘর, মাটির ঘর কোনটাই রেহাই পায়নি। টাশ টাশ করে ফুটেছিল বাঁশের খুঁটি, বাঁশের মাচা। উড়ে উড়ে দূরে গিয়ে পড়েছিল টিনের চালের টিনগুলো। জঙ্গলে পাহাড়ে, তাল গাছের শীর্ষে, পাহাড়ের প্রান্তরে। সেও এক ভয়াবহ দৃশ্য। সর্বভুক আগুনের প্রচন্ড চুবনে কসাই পাড়ার আশেপাশের বনজঙ্গল বৃক্ষলতা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সুনীল আকাশের নীলিমায় কেউ যেন মেখে দিয়েছিল সিন্দুরের ফাগ। লালে লাল হয়ে গিয়েছিল আকাশটাও। কিন্তু কোত্থেকে আসল এই আগুন। কেউ কি লাগিয়ে দিয়েছিল, নাকি দুর্ঘটনা? কিন্তু না, এ দুর্ঘটনা নয়। নয় এ রান্নাঘরের চুলার আগুন। নয় কোন ছোট বাচ্চার কুপির আগুন। তাহলে? তাহলে কোত্থেকে আসল এই আগুনের সর্বগ্রাসী অভিশাপ? কে বা কারা লাগিয়েছে এ আগুন? কেনই বা লাগিয়েছে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাও আবিষ্কৃত হয়ে গেল। ---- দূরে -- কাছে, এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে খয়রাতী মিঞার বাগানের গোরা মিলিটারীরা। হাতে তাদের বন্দুক রাইফেল। ঠোঁটে তাদের পৈশাচিক হাসির অঞ্জন। ছুটাছুটি করছে কসাই পাড়ার বাসিন্দারা। নারী পুরুষ শিশু যুবক বৃদ্ধ

সবাই। চেষ্টা করেছে ঘরের জিনিসপত্র বাঁচাতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু বাঁচানো যায়নি। নিভানোও যায়নি আগুন। সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কান্নার রোল উঠেছে সারা পাড়ায়। তবুও মোছেনি পিশাচ সাহেবদের ঠোঁটের পৈশাচিক ক্রূর হাসি। তারা দেখেছে আর হেসেছে। মজা পেয়েছে কালা আদমীদের আহাজারি, কান্না আর ছুটাছুটি দেখে। বালতি-কলসি ভরে ভরে পানি ঢেলেছে বেটা ছেলেরা। মেয়েরাও বসে ছিল না। বউ, ঝি, বৃদ্ধা যে যা পেয়েছে তা দিয়ে পানি দিয়েছে আগুনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। জ্বলে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে দেখতে দেখতে। বিরানা হয়ে গেছে কসাইপাড়া। মানুষগুলো হয়ে গেছে বাস্তুহারা। কারো কানে গিয়ে পৌঁছায়নি ছিন্নমূল কসাইপাড়াবাসীদের আর্তক্রন্দন। ফরিয়াদ জানিয়েছে তারা অনেকের কাছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

রাহাত শুনেছে এধরনের বহু বাস্তব কাহিনী প্রবীণদের মুখে। একটি মেয়েকে কেন্দ্র করেই নাকি আগুন লাগিয়েছিল গোরা সাহেবরা কসাই পাড়াতে। মেয়েটি যাচ্ছিল কলসী কাঁখে পুকুরে গোসল করতে। এক গোরা সৈন্য তার [illegible] আলুল গায়ের মদির যৌবন দর্শনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মেয়েটির ওপর। ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল তার দেহবল্লরীকে। মেয়েটির আর্তক্রন্দনে চারদিক থেকে ছুটে এসে কসাইপাড়াবাসীরা বেদম প্রহার করেছিল সেই গোরা সৈন্যটিকে। প্রহৃত হয়ে ছুটে গিয়েছিল সেই গোরা সিপাহীটি ক্যাম্পে। কিন্তু পরে পাগলা কুকুরের মত সৈন্যরা ছুটে এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিরানা করে দিয়েছিল কসাই পাড়াকে।

হে আল্লাহ! তুমি এদের বিচার কর। তোমার কহর নাজিল কর তাদের ওপর।

কসাইপাড়াবাসীর আর্ত ফরিয়াদে কোন ফল হয়েছিল কিনা কেউ জানেনা। কেউ জানে না সত্যিকার অপরাধীরা কোন প্রকার শাস্তি পেয়েছিল কিনা। কিন্তু সেই গোরা সাহেবরা আজ আর নেই। নেই সেই সৈন্যদের ক্যাম্পও। সেখানে গড়ে উঠেছে আজ বিরাট আমিন জুট ও কার্পেট মিল। হাজার হাজার লোক সেখানে কাজ করে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত বহু। রাহাতও তাদের একজন। কসাইপাড়া আজো আছে কসাইপাড়া মহল্লায়। অধিবাসীদের মধ্যে বৃটিশ

আমলের দু একজন ব্যতীত আজ আর কেউ বেঁচে নেই। আছে তাদের উত্তর পুরুষেরা। তাদের অনেকে আজকাল আমিন জুট মিলেও কাজ করে।

ঃ আপনারা তো কিছুই জানেন না, বাবা। আমরা তো অনেক কিছু দেখেছি। বৃটিশ আমলে বহুদিন ছিলাম রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনের চাল না হলে বাঙালীদের পেটের ভাত হত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চলে আসলাম স্বদেশে। এখানে এসেও দেখলাম অনেক কিছু। আজো দেখছি।

সেদিন রাহাতকে বলেছিল কসাইপাড়ার একবৃদ্ধ। রাহাতদের মিলেরই শ্রমিক কসাইপাড়ার জহিরের নানা। পঁচাত্তরোর্ধ্ব বয়স। সাদা ধব ধবে দাড়ি। দেখলেই মনে হয় লোকটা জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে জীবনে।

দুই

দরজায় অনবরত কড়া নাড়ানি ও ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে যায় রাহাতদের। ভীতিবিহ্বল হয়ে যায় রাহাত ও সামিনা। এতরাতে কে বা কারা এসে দরজায় হানা দেয়? কি তাদের উদ্দেশ্য? বেশ খানিক নিশ্চুপ থেকে সাহস সঞ্চয় করে রাহাত। জিজ্ঞেস করে-

ঃ কে?

ঃ আমরা শফিক ও জব্বর, স্যার। আপনার জুট মিলের শ্রমিক।

দরজার ওপার থেকে জবাব আসে বিহারী শ্রমিক শফিকের। হারিকেনের সলতে উস্কে দিয়ে ঘর আলোময় করল সামিনা। বিস্ময়-ভয়াতুর দৃষ্টিতে তাকাল রাহাতের দিকে। মুহূর্ত খানিক কি ভেবে দরজা খুলল রাহাত। ছিটকে পেছন দিকে সরে গেল দুর্গন্ধে। পায়খানার গন্ধ। কোত্থেকে আসছে এ অসহ্য দুর্গন্ধ! নিশ্চয়ই কেউ আশেপাশে ঘরে বাইরে পায়খানা ছিটিয়েছে।

ঃ পায়খানার গন্ধ কোত্থেকে আসছে? নিশ্চয়ই তোমরা কাপড়ে চোপড়ে পায়খানা করেছ?

ঃ না, স্যার। আমরা পায়খানা থেকে ওঠে আসছি।

জবাব দেয় শফিক। লুটে পড়ে জবরু ও শফিক দুজনেই রাহাতের পায়ের ওপর। চমকে ওঠে রাহাত।

ঃ একি, তোমরা এরকম করছ কেন?

ঃ স্যার, মারেন, কাটেন। যা করবার করেন। আপনিই করেন, স্যার। আমরা প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসেছি। আমাদের আপনিই বাঁচাতে পারেন, স্যার। একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন।

রাতে দশটা। অথচ মনে হয় যেন গভীর রাত। নিশুতি রাত। যে যেখানে পেয়েছে ঘুমিয়ে পড়েছে গাঢ় সুষুপ্তির ক্রোড়ে। থম থমে বিভীষিকা বিরাজ করছে যেন চতুর্দিকে। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে গোলাগুলির শব্দে। কোথাও কোন প্রকার কর্মচঞ্চলতা নেই। চতুর্দিকে কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব। কি হবে কি হবে ধরণের একটা আশংকা। যে যেখানে পেয়েছে মুখ গুঁজে লুকিয়ে পড়েছে যেন।

ঃ স্যার, আমাদের কলোনী লুঠ হয়ে গেছে। অনেক মানুষ মেরে ফেলেছে।

ঃ এ্যাঁ, বল কি। কারা করেছে এসব?

ঃ মিলের শ্রমিকও আছে। আশপাশের পাড়া থেকে বহুলোক দা ছুরি কিরিচ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের কলোনীতে চড়াও হয়ে ঘর বাড়ী লুঠ করে জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। অনেককে মেরে ফেলেছে। অনেকে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণের ভয়ে। সেখানে গিয়েও তাদের হত্যা করা হয়েছে। কারো ফরিয়াদ কেউ শোনেনি। মসজিদ লালে লাল হয়ে গেছে মানুষের রক্তে। আমাদের অপরাধ-আমরা বিহারী, বাঙ্গালী নই, উর্দুতে কথাবার্তা বলি। আমার আব্বাকেও মেরে ফেলেছে।

ঃ ইদু সর্দারকেও মেরে ফেলেছে। উইভিং ডিপার্টমেন্টের হেড সর্দার ইদু মিঞা আর নেই।

ঃ পায়খানার মধ্যে সারাদিন লুকিয়ে থেকে রাত্রের অন্ধকারে কোনমতে পালিয়ে এসেছি আমরা। কে কে বেঁচে আছে, না আছে জানি না।

ঃ এখন তোমাদের কি করে বাঁচাব আমি, তাই ভাবছি। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে যে দোতলা বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে রাইফেল্‌স, পুলিশ আর আনসারেরা ঘাঁটি করেছে। কোনমতে ওরা জানতে পারলে-তোমরা এখানে আছ, তাহলে তোমাদের রক্ষা করা যাবে না। এমন কি আমাদেরও বিপদ হতে পারে।

ঃ কোনমতে রাতটা কাটাতে পারলে, স্যার, শেষ রাতে আমরা গ্রামের দিকে চলে যাব। আমরা বাংলা আর চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলতে পারি। কেউ আমাদের ধরতে পারবে না।

ঃ আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তোমরা এক কাজ কর। আমাদের পুকুরে গোসল করে কাপড়চোপড়গুলো পাল্টিয়ে এগুলো পরে এস। তারপর কিছু খাও। সারাদিন না খেয়ে আছ।

দুজনকে দুখানা লুঙ্গি ও দুটা শার্ট দিল রাহাত। গায়ে মাখা সাবানও দিল। গোসলগাসল করে কাপড়চোপড় পাল্টে ঘরে আসলে ওদেরকে খাবার দেয়া হল। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক কথা বলল ওরা। ভারত থেকে মোহাজির হয়ে এসে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। পাকিস্তান টিকে থাক-এটা চাওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও তো তারা সক্রিয়ভাবে কোন কিছুই করেনি। কেন তবে তাদের ওপর এই অত্যাচার! উর্দুভাষী বলেই কি তাদের অপরাধ! ইত্যাকার কিছু কিছু অভিযোগ তারা করলেও রাহাত কিন্তু তাদের বলল-

ঃ দেখ, তোমরা যখন এদেশে এসেছ, তোমাদের মিশে যেতে হবে এদেশের জনগণের সঙ্গে। যদি তোমরা তা না করে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখতে চাও তাহলে তো সংঘাত হবে। সে যাক, এখন তোমরা চল। তোমাদের আমি একটা পোড়ো বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে কোনমতে রাতটা কাটিয়ে শেষ রাতে কিংবা অন্ধকার থাকতে সকালের দিকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে তোমরা চলে যেও।

শফিক ও জবরুকে একটি পোড়ো বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে রাহাত ফিরে আসে নিজের ঘরে।

তখন প্রায় রাত বারোটা। গাঢ় নির্জনতা বিরাজ করছে চতুর্দিকে। মাঝে মধ্যে গোলাগুলির শব্দ কানে আসে। পরের দিন অন্যান্য লোকদের মত রাহাতও বের হয় শহরের রাস্তায়। রাস্তায় রাস্তায় তখন টহল দিচ্ছে উন্মুক্ত ট্রাকে চড়ে আনসার পুলিশ রাইফেলসের জোয়ানেরা। জনগণের মধ্যে সেকি উৎসাহ, উদ্দীপনা! স্বাধীন বাংলাদেশ তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। চোখে মুখে দৃষ্টিতে অপূর্ব দীপ্তি। বাংলাদেশের প্রথম মুক্ত শহর চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের অলিগলি পথঘাট সর্বত্র বাঙ্গালী সৈনিকদের আনাগোনা। কোথাও কোন পাকিস্তানী কিংবা পাকিস্তানপন্থীর টিকিটি পর্যন্ত নেই। চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ বেতার কেন্দ্রে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা। সেখান থেকেই ঘোষণা করলেন মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে "আমি মেজর জিয়া বলছি" এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি রেডিও শ্রোতার কর্ণকুহর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বয়ে গেছে বাংলাভাষীদের শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায়।

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়"। এই মহামন্ত্রে তারা আজ দীক্ষিত। উজ্জীবিত তাদের প্রতিটি রক্ত কণিকা। দু'চারদিন যেতে না যেতেই সবাই দেখতে পেল নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির অবাঙ্গালী অভিজাত বাসিন্দাদের ঘরবাড়ী লুঠতরাজ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানপন্থী অবাঙ্গালীদের তারা বাংলার মাটিতে থাকতে দেবে না। যে যা পারছে, ফ্রিজ, টেলিভিশন, টু-ইন-ওয়ান, ফার্নিচার, কাপড় চোপড়, ক্রোকারিজ ইত্যাদি লুঠতরাজ করে নিয়ে যাচ্ছে যে যেখানে ইচ্ছে সেখানে, কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে না। দরজা জানালা ভেঙ্গেও নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। অনেক অবাঙ্গালী প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে এক একজন এক এক দিকে। যে কজন লুকিয়ে চুকিয়ে ছিল তাদেরকেও কেউ কেউ মেরে ফেলেছে। কেউ কেউ মেয়েদেরকেও বেইজ্জত করেছে বলে রটনা রটেছে চতুর্দিকে। আবার কাউকে কাউকে কোন কোন বাঙ্গালী মানবতার খাতিরে আশ্রয় দিয়ে গোপন স্থানে লুকিয়েও রেখেছে। কোথাও কোন আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের তৎপরতা নেই। সবখানে শুধু যুদ্ধ প্রস্তুতি। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি। মারি অরি পারি যেমতে। এ মন্ত্রে আজ বাঙ্গালীরা উদ্বুদ্ধ। ঘরবাড়ী

অফিস আদালতের সবখানে পত্‌পত্‌ করে ওড়ছে বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত সবুজ পতাকা। টহলদার বাঙ্গালী জোয়ানদের হালকা মেশিন গান সজ্জিত টহলের ভঙ্গী দেখে মনে হয় ভারী অস্ত্রের সুদক্ষ পাকিস্তানী আর্মিদের তারা থোড়াই কেয়ার করে।

ঃ চট্টগ্রামকে আমরা পাকিস্তানীমুক্ত করেছি। যে কজন এদিকে ওদিকে লুকিয়ে ঘাপটি মেরে আছে তাদেরকেও খুঁজে নিয়ে শেষ করে দেব । তারপর আমরা অগ্রসর হব কুমিল্লার দিকে।

জনৈক সিপাহী হাবিলদারের মন্তব্যে বাঙ্গালী তরুণেরা ভীষণভাবে অনুপ্রেরিত হয়ে যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। বিলুপ্ত হয়ে যায় তাদের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সন্দিগ্ধ নৈরাশ্যের শেষচিহ্নটুকুও।

ঃ আমার কাছে একটি ফ্রিজ ও একটি টেলিভিশন আছে। বিক্রি করব। নেবেন, ভাইজান?

প্রতিবেশী মিয়ার বাপ এসে একদিন রাত্রে প্রস্তাব দেয় রাহাতকে। রাহাত হতভম্ব হয়ে যায় মিয়ার বাপের প্রস্তাব শুনে।

ঃ নিয়ে নাও না। এই সুযোগ আর পাবে!

সামিনা পীড়াপীড়ি শুরু করে রাহাতকে। ওর বড় ইচ্ছে এই সুযোগে কিছু মালামাল খরিদ করে ঘরের আসবাবপত্র সংগ্রহ করে। ওদের সংসারে এখনো অভাব রয়েছে অনেক কিছুর। না আছে সোফা সেট। না আছে আলমারী, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি।

ঃ টাকা পয়সা একদম নেই। বেতনও পাইনি এখনও।

ঃ খুবই সস্তা। নামকা ওয়াস্তে দাম মাত্র।

ঃ এই সুযোগ আর পাবেন না।

মিয়ার বাপের বার বার অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হয় সামিনা। মিয়ার বাপের চেয়ে তার পীড়াপীড়ি শুরু হয় সবচেয়ে বেশী।

ঃ টাকা কোথায়?

ঃ এক কাজ করেন, ভাইজান। টাকা না হয় কিছুদিন পরে দেবেন।

ঃ দামও তো দিতে হবে।

ঃ তোমাকে কি কেউ মুফত্ দেবে! সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

ঃ তাই বলে লুঠের মাল!

ঃ আমরা তো আর লুঠ করছিনা। আমরা তো পয়সা দিয়ে কিনে নিচ্ছি। ----- মিয়ার বাপ, তুমি এখন যাও। আমি তোমার ভাইকে রাজী করিয়ে তোমাকে খবর পাঠাব। তুমি আবার এগুলো অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিও না যেন।

ঃ ঠিক আছে, ভাবী। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।

মিয়ার বাপ চলে গেলে পর সামিনা আবার চেপে ধরে রাহাতকে। আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে নানাভাবে।

ঃ কেন তুমি অমত করছ। কালে ভদ্রে সুযোগ আসে। আমার কাছে কিছু টাকা আছে। ওগুলো আমি দেব।

ঃ জেনে শুনে লুঠের মাল খরিদ করব।

ঃ কে না করছে? সবাই তো আর মিয়ার বাপদের মত লুঠতরাজ করতে যায়না। যারা যায় না তারাও ওদের কাছ থেকে কেনে, ঘরের আসবাবপত্রের শোভা বর্ধন করে।

ঃ আমি পারব না।

ঃ তোমার ঐ এক কথা। জান, বাকুরা কত অলংকার কিনেছে ! ফতুরা ফার্নিচার। শাকিলারা ঘড়ি ও কাপড় চোপড়। আরও কতজনে কত জিনিস কিনেছে।

ঃ অসম্ভব। কোন সৎ মানুষের পক্ষে এসবকে প্রশ্রয় দেয়া সম্ভব নয়।

ঃ সারা দুনিয়ার মানুষ করছে। আর তুমিই শুধু একমাত্র সৎ হয়ে ঘরের কোণে বসে থাক। বাজার থেকে কেনার মত এক পয়সার মুরোদ তো নেই। ঘরে এসে যেচে দিচ্ছে যে, তাও উনি নিতে পারবেন না। উনার সততায় বাধছে। ---- আমার পোড়া কপাল এমন মানুষের ঘরে এসে পড়েছি। ---- এখনও তো একটি মাত্র মেয়ে। ভবিষ্যতে আরো হলে যে কি অবস্থা হবে কে জানে। মানুষ সংসার হালকা থাকতেই যা কিছু করে। ভারী হলে আর পারে না। ঘরে

এসে লক্ষ্মী সাধছে ,তবুও উনার মন থামছে না। ------- আমার অদৃষ্টে আরো কত ভোগান্তি আছে কে জানে!

দুপদাপ করে পা ফেলে অন্য ঘরে চলে যায় সামিনা। হতভম্বের মত চেয়ে থাকে রাহাত তার দিকে। সত্যিই কি রাহাত ভুল করছে। কত মানুষ কত জিনিস তো নিজেরা গিয়েও নিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অনেককে ভাল মানুষ বলেও জানে রাহাত। প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুনতে হয়েছে রাহাতকে-

ঃ কি যে বলেন, রাহাত সাহেব। ওসব লোকেরা আমাদের বাঙ্গালীদের সম্পদ শোষণ করেই বড়লোক হয়েছে। তাদের মালপত্রে আমাদেরও হক রয়েছে। আমরা আমাদের হক নিচ্ছি। এতে গুনাহ হবে কেন।

তবুও রাহাতের বিবেক কোনমতেই সায় দেয় না এতে। কি করে সে ভাববে যে এ অন্যায় নয়।

ঃ সস্তায় পেলে কিছু মালামাল এসুযোগে নিয়ে নাও। আমি তো দুটো ফ্রিজ কিনেছি। একটা বাসার জন্য। একটা দোকানের জন্য।

মুদির দোকানদার প্রতিবেশী হাজী নওয়াব মিয়াও বলেন একই কথা। নামাজ পড়েন যে নওয়াব মিয়া; উগ্র মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানপন্থী বলে যার পরিচিতি। এদের মত লোকেরাও কিনছে পাকিস্তানপন্থী বলে খ্যাত অবাঙ্গালীদের বাড়ী ঘর থেকে লুঠ করে আনা মালামাল। অথচ ইতস্ততঃ করছে রাহাত।

ঃ আরে বাবা, আমি তুমি না কিনলে কি হবে! কেনার মত মানুষের তো অভাব নেই। ---- আর তাছাড়া আমরা তো হক পয়সা দিয়ে কিনছি। আমরা তো আর চুরি ডাকাতি করছি না।

ঃ কাকে কি বলছেন, চাচা! আপনার ভাতিজার জন্য এ নাকি অন্যায়।

সামিনার কথা শুনে হাসেন বৃদ্ধ হাজী নওয়াব মিয়া। সামিনা যে ভেতরে ভেতরে রাহাতের ওপর বিক্ষুব্ধ তা বুঝতে বাকী থাকে না হাজী সাহেবের। হাজার হোক সংসারী মেয়ে তো। প্রত্যেক সংসারী মেয়েই তো কামনা করে তার সংসারের গৃহসামগ্রীর শূন্যতা ভরে যাক বিভিন্ন মাল সামানায়। তার গৃহস্থালী হয়ে উঠুক পরিপূর্ণ। হ্যাঁ, তা-ই। শুধু হাজী নওয়াব মিয়াই নন। আরো

অনেকে কিনেছে এরকম অবাঙ্গালীদের লুণ্ঠিত মালামাল। এও হয়তো এক প্রকারের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

বউ মা ঠিকই বলছে, রাহাত। আমরা তো দিনরাত অন্যায়ের মধ্যেই ডুবে আছি। জান্তে অজান্তে কত রকমের পাপ যে আমরা করছি তার কোন হিসেব নেই। মাফ করনেওয়ালা আল্লাহ্। সুযোগ যখন এসেছে, সস্তা দামে কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া যাচ্ছে। কিনবে না কেন? সবাই যখন কিনছে। আমি তুমি তো এসব প্রতিরোধ করতে পারব না। সে চেষ্টাও বৃথা। কাজেই স্রোতের মুখে নিজকে ভাসিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

হাজী নওয়াব মিয়া মানুষটা মন্দ না। শৈশব থেকেই রাহাত দেখে এসেছে তাঁকে। রাহাত-সামিনাকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁর এক সময় বড় ইচ্ছে ছিল তাঁর তৃতীয় মেয়ে সিফাতকে রাহাত বিয়ে করুক। তাঁর স্ত্রী মাসুদা খাতুন তো রাহাত বলতে ছিলেন অজ্ঞান। ঘরে যে কোন সময় যে কোন রকম পিঠাআটা, নাস্তাটাস্তা তৈরি হোক, কিংবা অন্য কোন প্রকার ভাল খাবার তৈরি হলে রাহাতের ডাক পড়বেই।

ঃ কে খাওয়াবে ছেলেটাকে আদর করে একটা ভাল কিছু? ওর তো মা বাপ বলতে কেউ নেই। আছে একমাত্র বড় ভাই আর ভাবী। তারাও তাদের ছেলে মেয়েকে নিয়ে কুলিয়ে ওঠতে পারে না।

রাহাত তখন কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র। কষ্ট করে লেখাপড়া করছিল বলে সবাই তাদের আদর করত। সিফাত ছিল টেনের ছাত্রী। রাহাতের কাছে এটা ওটা বুঝিয়ে নিতে আসত। বাপ মার কাছে শুনতে শুনতে তারও যেন কেমন এক প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল রাহাতের প্রতি। রাহাত ছিল কিন্তু অন্য ধাঁচের ছেলে। লেখাপড়া ব্যতীত অন্যকোন বিষয়ে সে চিন্তাই করত না। এজন্য বন্ধু বান্ধবরা রাহাতকে ডাকত দরবেশ সাহেব বলেই।

ঃ তোমার মত ছেলে বর্তমান যুগে অচল, রাহাত। সহপাঠী রউফ তো একদিন বলেই বসেছিল রাহাতকে। হয়ত বা তা-ই। সহপাঠিনী মেয়েরা নাকি রাহাত সম্পর্কে বলাবলি করত-

ঃ ওই ছেলেটা কথাবার্তা বলাতো দূরে থাক, ফিরেও কোন দিন কোন মেয়ের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে কেউ কোন দিন দেখেনি।

অদ্ভুত ধরণের ছেলে। এক সঙ্গে লেখাপড়া করতে গেলে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কত ব্যাপারে আলাপ সালাপ করে। এ কিন্তু ব্যতিক্রম।

ঃ আসলে দুর্বল মনের মানুষ তো। ওপরের খোলস এটা-কোন কোন বন্ধু বান্ধবের মন্তব্য ছিল আবার রাহাত সম্পর্কে এরূপ। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু অন্যকিছু। বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করছিল বলে রাহাতের মনের শক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। কোন ব্যাপারে সে সাহসিকতার সঙ্গে এগুতে পারত না। না পারত সে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্ব করতে। না পারত কারো সঙ্গে কোন ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে। সিফাত মেয়েটিও কিন্তু দেখতে শুনতে কম আকর্ষণীয় ছিল না। দশ বারো বছর পার হতে না হতেই কেমন যেন লক লকে পুঁই ডাঁটার মত দেহবল্লরীর পাতায় শিরায় আবীর ছড়িয়ে সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতায় মন্ডিত হয়ে বড় হয়ে ওঠেছিল সিফাত। রাহাত দেখেছে আর দেখেছে। দেখেছে আরো অনেকে। বিম্বৌষ্ঠে যখন মোহনীয় হাসির ছটা ছড়িয়ে সিফাত এসে বলত-

ঃ ভাইয়া, আম্মা আপনাকে যেতে বলেছে।

সিফাতের হরিণী চোখের মায়ার টানে কখনো কখনো রাহাত মন্ত্রমুগ্ধের মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটে গেছে সিফাতদের ওখানে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বহুদিন ওরকম রাহাত ছুটে গেছে সিফাতদের ঘরে। আপ্যায়িত হয়েছে সিফাত ও ওর মার আদর যত্নে। তথাপি মিলন হয়নি রাহাত আর সিফাতের। হতে পারেনি ওদের বিয়ে।

ঃ লেখাপড়া শেষ করে চাকরী বাকরী একটা ধরতে না পারলে কি করে ওর বিয়ের কথা ভাবতে পারি!

রাহাতের বড় ভাইয়ের কথায় ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেছে সবাই। কথাটায় যে যুক্তি আছে অস্বীকার করা যায় কি করে। এরপরেও কেন যেন সিফাতের নরম মনের গোপন কন্দরে একটি সুপ্ত আশা ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছিল। রাহাত হয়ত একদিন সাহসী হয়ে ওর পাশে গিয়ে

[illegible]। কিন্তু হাবে ভাবে আচার আচরণে কোনদিনই তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। অজস্র লজ্জার জগদ্দলভারে কুঁকড়ে থাকত বলে সিফাতের অন্তরের ছাইচাপা আগুনও ধীরে ধীরে মিইয়ে গেছে। সিফাত হয়ে গেল একদিন অন্যজনের। ফারুকের ঘরেই বধূ বেশে যেতে হল একদিন সিফাতকে। ব্যবসায়ী ফুফাতো ভাই ফারুকের মায়ের বড় ইচ্ছে, ভাইজি সিফাতকে চিরদিনের জন্য বউ করে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। কিন্তু মাসুদা খাতুনের নজর ছিল রাহাতের ওপর। শিক্ষিত, ভদ্র, অমায়িক রাহাতের মত একটি ছেলেকে জামাই হিসেবে পাওয়া কি চারটিখানি কথা! কিন্তু তাঁর সে আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে নি।

ঃ এর পরেও কি করে তুমি আশা করতে পার!

স্বামী নওয়াব মিয়া বিরক্ত হয়ে যান পত্নী মাসুদা খাতুনের ওপর। এদিকে তাঁর ভাবী ফারুকের মায়ের পীড়াপীড়ির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

ঃ ভাইজান, আমার ফারুক কি কোন দিক দিয়ে অনুপযুক্ত আপনার সিফাতের? মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দেন।-----ভাবী, তোমাকেও বলি। ফারুক তো তোমার চোখের সামনেই বড় হয়েছে। সে কি কোন দিক দিয়ে খারাপ! শিক্ষাদীক্ষা, রুজি রোজগার যে দিক দিয়েই বিচার কর না কেন আমার ফারুক কোন দিক দিয়েই ফেলনা নয়।

না, ফেলনা তো নয়ই। বরং অনেক দিক দিয়ে লোভনীয়ও। বাপ মার যোগ্য তৃতীয় সন্তান গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীধারী ফারুকের মত পাত্রকে যে কেউ লুফে নেবে। গ্রামে বিরাট পৈতৃক বাড়ীঘর ব্যতীতও রয়েছে বিস্তর জায়গা জমি। হাজার হাজার টাকার ফসল উৎপাদন হচ্ছে সেসব জমি থেকে। বড় দুই ভাই থাকে সেই ব্যবসার পরিধি প্রসারে সদাব্যস্ত। আর ফারুক থাকে বিপণি বিতানের ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর নিয়ে। অভাব বলতে কোন জিনিস ফারুকদের সংসারে নেই। এমন প্রাচুর্যময় সংসারে বৌ হতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ফারুকের সঙ্গে বিয়ের বাগদানে সিফাত হয়ে গিয়েছিল মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের মত। প্রেম নয়, প্রীতি নয়। আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ নয়। অঙ্গীকার নয়, প্রতিশ্রুতি নয়। তথাপি সিফাত যে বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল অপরাধীর মত। দলছুট পাখীর মত দিশেহারা অনুভব করেছিল নিজকে।

ঃ কি গো ননদিনী, জা করে নিয়ে এসেছি বলে কি চোখ খুলতে লজ্জা করছে? নারে ভাই। কেউ নেই। এখানে আমি একাই। খোল না একবার চক্ষুদ্বয়। দেখি না তোমার দৃষ্টির অতল সমুদ্রে আমাদের ফারুক সাঁতরাতে পারবে কিনা।

ফারুকের বড় ভাবীর রসিকতায় ভীষণভাবে রাঙা হয়ে গিয়েছিল সেদিন সিফাত। লজ্জায় নুইয়ে পড়েছিল। চিমটি কেটেছিল বড় ভাবীকে।

ঃ যাও, ভাবী। তুমি বড় দুষ্টু। আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। ফুফুকে বলে দেব।

ঃ নারে বোন, কাঁদতে হবে না। কাঁদাবার জন্য তোমাকে আনি নি---- আর ফুফু বলছ কেন? এখন থেকে উনি ফুফু নন। শাশুড়ী। আম্মা বলতে হবে।

ঃ প্রাণ গেলেও আমি পারব না।

ঃ ঠিক আছে, ভাই। তোমরা ফুফু ভাইঝি যা ইচ্ছে ডাকাডাকি করো গা। আমরা বলার কে। আমরা তো পরের মেয়ে।

সে আজ সাত আট বছর আগের কথা। এখন সেই সিফাত দুসন্তানের জননী। বিয়ের পর বহুবার বাপের বাড়ী এসেছে। রাহাতেরও মুখোমুখি হয়েছে বেশ কয়েকবার। মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। অদৃশ্য কোম এক শক্তি যেন মাথা চেপে রেখেছে ওর নীচের দিকে। চোখের পাতাকে আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে রাহাতের দিকে তাকাবার সময়। যদিও সে কয়েকবার কদমবুচি করেছে রাহাতকে। বিদ্যুৎ স্পর্শের মত এক অদ্ভুত অনুভূতি ওর সমস্ত শরীরের শিরা উপশিরায় শীতল প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়েছিল। একদিন এই রাহাতকে কি ও স্বামী হিসেবে কল্পনা করে নি! আজ সেসব কথা মনে পড়লে নিছক পাগলামী বলে মনে হয় নিজের কাছে। কিন্তু তবুও কেমন যেন একটা লাজ নম্রতার উত্তরীয় সিফাতের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে ফেলে মুখোমুখি হলে রাহাতের, এ সত্যটাকে কি করে রুদ্ধ করে রাখবে মনের ঠাটানি দিয়ে। এ তো অস্বীকার করা যায় না। ---- হ্যাঁ, রাহাত বা রাহাতের ভাই ভাবী কেউ ওদের কিছুই নয়। অদৃশ্য কোন প্রকারের আত্মীয়তার সূত্রও নেই সিফাত রাহাতদের মধ্যে। শুধু পাড়া প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক। যুগ যুগ ধরে বসবাস

করে আসছে ওরা একই মহল্লায় পুরুষানুক্রমে বহু বছর ধরে। এ-ই সৃষ্টি করেছে মহল্লার বাসিন্দাদের মধ্যে এক অনাবিল আত্মীয়তার বন্ধন।

ঃ রাহাত, রাহাতের বড় ভাই মাহবুব আমার পুত্রতুল্য। ওদের বাপ স্কুল শিক্ষক আদিল সাহেব ছিলেন আমার ভাইয়ের মত। আজকে আদিল সাহেব বেঁচে নেই। কিন্তু আমি তো আছি। মুরব্বী হিসেবে ওদের খবরাখবর যদি না নেই আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব!

এখনও হাজী নওয়ার মিয়া সবাইকে বলে বেড়ান সেকথা। তাঁর তিনটা মেয়ের মধ্যে সিফাত ছোট। সবার ছোট একটি ছেলে তাঁর আছে, শাকিল। তিনটা মেয়েই তাঁর সচ্ছল পরিবারের বধূ হয়ে গেছে। শাকিল এখনও লেখাপড়ায় আছে। মাঝে মধ্যে তাঁর ব্যবসাও দেখাশোনা করে।

ছেলেটা লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসার হাল ধরতে পারলেই আমার মুক্তি।

রাহাতরাও হাজী নওয়াব মিয়াকে আপন চাচার চেয়ে কোন অংশেই কম জানে না। আপদে বিপদে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে যায়। সামিনা যেদিন প্রথম বৌ হয়ে এসেছিল রাহাতের ঘরে, সেদিন সবচেয়ে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছিলেন হাজী নওয়াব মিয়া ও তাঁর স্ত্রী মাসুদা খাতুন।

ঃ কইরে, তোমরা কোথায় গেলা? মাহবুবের বৌ, ও মাহবুবের বৌ! নতুন বৌ এসে গেছে। তোমরা বৌমাকে ঘরে নিয়ে যাও না।

হাজী সাহেবের উৎসাহ ও চেঁচামেচিতে সবাই ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। মাসুদা খাতুনের কণ্ঠ আরও এক ডিগ্রী চড়া।

ঃ ও, সিফাত! মাহবুবের বৌকে ডেকে নিয়ে রাহাতের বৌকে ঘরে তুলে নিয়ে যা না।

সিফাত এসেছিল সে সময় বাপের বাড়ীতে বেড়াতে। ওর অন্য দুবোন অত ঘন ঘন বাপের বাড়ী বেড়াতে আসতে পারে না। ওদের সংসার ভারী হয়ে যাওয়ায় ওরা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে নিজেদের সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে। সিফাতের মাত্র একটি সন্তান। আরেকটি তখনও পেটে। রাহাতের বৌকে দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম সিফাতের। এত মিষ্টি সামিনা ভাবী! এর পূর্বে কখনো দেখেনি সে সামিনাকে। অন্য কেউও দেখেনি। এমন কি একটি

ছবিও না। বিয়ের পূর্বে কেবল রাহাতই দেখেছে একবার সামিনাকে ঢাকায় গিয়ে। লাল কাতানে জড়ানো সামিনার ডাগর ডোগর চোখ দুটাতে অদ্ভুত মায়া। মেহেদী রাঙা হাতের সেকি মোলায়েম স্পর্শ! সিকাত ওকে জড়িয়ে ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে যায় রাহাতদের ঘরে। ছুটে আসে মাহবুবের বৌ। ছুটে আসে মাসুদা খাতুন। ছুটে আসে পাড়া প্রতিবেশী ছোট বড় সকল মেয়ে লোকেরা। এদের কেউ সামিনাকে আগে দেখেনি। দেখেনি সামিনার একটি ফটোও। এমন কি বরযাত্রী হওয়াও কারো ভাগ্যে জোটেনি। আর জুটবেও বা কি করে! উত্তর বঙ্গের মেয়ে সামিনা। চট্টগ্রামের ছেলে রাহাত। ধরতে গেলে বাংলাদেশের এ প্রান্ত আর ও প্রান্ত। এ চট্টগ্রামে সামিনার আপন বলতে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের এক ভাবী তখন থাকতেন চট্টগ্রামে। তাঁর মাধ্যমেই কথাবার্তা হয়েছিল মাহবুবের সাথে। কথায় কথায় তিনি একবার বলেছিলেন—

ঃ আমার এক ননদ আছে। বড় ভাল মেয়ে। কলেজের তৃতীয় বর্ষে পড়ে। উপযুক্ত ছেলে পেলে বিয়ে দিয়ে দেব।

ঃ চিটাগাং-এ দেবেন?

ঃ কেন দেব না?

ঃ আমার এক ভাই আছে ল কলেজে পড়ে। দেবেন?

ঃ তাহলে তো কথাই নেই। মেয়েটির ভাই এখানে আম বাগানে ব্যাচেলার কোয়ার্টারে থাকে। রেলে চাকরী করে। আমি তার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাব।

হ্যাঁ, এভাবেই সামিনার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল রাহাতের। আট দশ জন মানুষের ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ ভাবীটির বাসাতেই। কোন জাঁকজমকপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান বা কোন ব্যয়বহুল পার্টির প্রতি কোন পক্ষেরই আগ্রহ বা মোহ ছিল না বলেই সংক্ষেপে স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল রাহাত সামিনার বিবাহানুষ্ঠান। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সবাই। বর্তমান যুগেও কি এ ধরণের বিয়ে হয়! কিন্তু হ্যাঁ, রাহাত সামিনার মত প্রগতিশীল মনের বর কনেই স্থাপন করতে পেরেছিল সেদিন এ প্রকারের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

তিন

সকালে ঘুম থেকে ওঠে চা নাস্তা সেরে বেলা সাত আটটার দিকে বেড়াতে বের হয় রাহাত । কাজ কর্ম হীন অলস মুহূর্তগুলোকে ঘরের কোণে অর্থহীন ভাবে ক্ষয়িত করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই ভেবে পদব্রজে চলতে গিয়ে রাস্তা জরিপের কাজেই যেন নিয়োজিত হয়ে পড়ে রাহাত। পিঁপড়ার মত কিলবিল করছে বেকার জনতার বেশুমার ঢেউ রাস্তায় রাস্তায়। প্রবর্তক সঙঘ অতিক্রম করে রাস্তা পার হয়ে মেহেদীবাগ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুতেই চমকে উঠে রাহাত । সতেজ সবুজিমার চাদরে জড়ানো পাহাড়ের তলদেশে গর্ত গহবরে এত ভিড় কেন মানুষের? এক দুর্দম আগ্রহ টেনে যেন নিয়ে যায় রাহাতকে সেদিকে। কয়েকজন আদম সন্তান লাশ হয়েপড়ে আছে ওখানে। দেখছে, ভিড় জমিয়ে। দেখছে আবর্জনার মত নিক্ষিপ্ত কতিপয় প্রাণহীন ধড়।

ঃ পাঞ্জাবীদের লাশ । ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল এখানে ওখানে । অনেক কষ্ট করে খুঁজে নিয়ে মারা হয়েছে ওদেরকে।

ঃ বেশ করেছে । বেঁচে থাকার সুযোগদিলে বাগে পেলে যে কোন সময় ছোবল মারত।

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করছে ভিড়ের মধ্য থেকে লোকজন। কারো কারো চোখেমুখে অনাকাংক্ষিত সাফল্যের তৃপ্তির জৌলুস । বিদেশী এজেন্টদের কোন অধিকার নেই এদেশের মাটিতে বেঁচে থাকার । তারা হানাদারদের দোসর। বাংলার দামাল ছেলেরা আজ দৃঢ়সংকল্প, শত্রুমুক্ত করবে তারা এদেশকে।

ঃ আপনি কি এ এলাকায় থাকেন, চাচা?

ঃ হ্যাঁ ,বাবা। ওদিকেই আমাদের বাড়ী।

শুভ্র শ্মশ্রুধারী জনৈক পথচারী বৃদ্ধের সাক্ষাতে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পায় রাহাত। চেহারা সুরতে তাঁর বর্ষণাতুর মেঘের ঘনঘটা । বিস্ময় জাগে রাহাতের মনে।

ঃআপনি এ মৃতদের চেনেন নাকি ,চাচা ?

ঃদু একজনকে চিনি । এরা অবাঙ্গালী ।

পথ চলতে শুরু করে দেন বৃদ্ধ লোকটি। গৃহাভিমুখেই তাঁর যাত্রা। ক্লান্ত পদের শ্লথ গতি ক্ষিপ্রতর হয়। কি যেন ভেবে রাহাতও সঙ্গ নেয় বৃদ্ধের।

ঃকেন লোকগুলোকে মারা হল, চাচা? ওরা তো কোন অপরাধ করেনি।

ঃ শুনেন নি ওরা অবাঙ্গালী, পাঞ্জাবী।

ঃ অবাঙ্গালী হলেই কি মারতে হবে!

ঃ এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

সমগ্র মুখমন্ডলে বিরক্তির অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের। বিতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টি ফেলে রাহাতের দিকে পুনরায় পথ চলতে শুরু করে দেন।

ঃ না, বলছি এজন্যে যে, শেখ সাহেব তো বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই বাঙ্গালী। যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন সে।

ঃ কেউ নেতার কথার দাম না দিলে আপনি আমি কি করব!

বিরক্তির ঝাঁজে বিকৃত বৃদ্ধের কণ্ঠ। কিছুদূর অগ্রসর হতেই রাস্তার ডানদিকের নিঝুম বাসভবনগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়ে রাহাতের। কয়েক মাস আগেও এই বাড়ীগুলি ছিল কল কাকলিতে মুখর। মানুষজন ছেলে মেয়েতে ছিল এই অট্টালিকাগুলি ভর্তি। আজ সেখানে খাঁ খাঁ করছে পীড়াদায়ক শূন্যতা। বাড়ীগুলির দরজা জানালা একটিও নেই। নেই কোন ঘরে আসবাবপত্রের ছিটে ফোঁটাও। জনমানবহীন ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ীগুলোকে মনে হয় যেন রাক্ষসপুরী। কোন্ দৈত্যদানবেরা লুঠতরাজ করে সব নিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না।

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, রাহাত?

কাঁধে কার স্পর্শে চমকে ওঠে রাহাত। পেছন ফিরে তাকিয়ে আশ্বস্ত বোধ করে।

ঃ ও, বশর!

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, চল।

ঃ কোথায়?

ঃ আরে, এস না।

হাত ধরে একরূপ টানতে টানতেই যেন বশর নিয়ে যায় রাহাতকে। রাহাতের স্কুল জীবনের বন্ধু বশর ছোটখাট একটা ব্যবসা করে কাল গুজরান করে। রেয়াজউদ্দীন বাজারে আছে তার একখানা ছোট কাপড়ের দোকান। জিজ্ঞেস করে রাহাত।

ঃ আজ দোকানে যাওনি?

ঃ দোকান! —— দোকানপাট কোথাও খোলা দেখেছ?

ঃ তাই তো।

ঃ ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ। দোকানে কর্মচারী একটা সব সময় থাকে। নইলে যে কোন সময় লুঠতরাজ হয়ে যেতে পারে। আইন শৃঙ্খলা নেই। কে কাকে বাধা দেবে। প্রত্যেক দিন গিয়ে খবরাখবর নিতে হয়। আজকেও গিয়েছিলাম। এখন সেখান থেকেই ফিরছি।

নিশ্চয়তা নেই, কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। সর্বত্র কেমন যেন একটা বিরানা বিরানা পরিস্থিতির আধিপত্য বিরাজমান। ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে মানুষ একদিক থেকে অন্যদিকে। এক রাস্তা থেকে অন্যরাস্তায় লক্ষ্যহীন খড়কুটোর মত। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ। কখনও তীব্র, কখনো স্তিমিত।

ঃ জান, এখনো সারেন্ডার করছে না খালেক কাবুলীওয়ালা। তার চার তলা বিল্ডিং চারদিকে ঘিরে রেখেছে লোকজন।

বশরের কথায় তার দিকে ফিরে তাকায় রাহাত। প্রশ্নাতুর দৃষ্টি মেলে ধরে জিজ্ঞেস করে-

ঃ কার কাছে সারেন্ডার করবে? এখানে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে! না, সরকার আছে! সে ঘরের বের হলেই তো তাকে মেরে ফেলবে সবাই।

ঃ তা তো মারবেই।

ঃ কি বলছ তুমি! তার অপরাধ?

ঃ সে যে কাবুলীওয়ালা।

ঃ কাবুলীওয়ালা তো পাকিস্তানী নয়। আর তাছাড়া সেতো রাজনীতি করে না। সে তো টাকা লাগানোর ব্যবসার জন্যেই এদেশে এসেছে।

ঃ যাই হোক। জনসাধারণের ধারণা সব একজাত। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা সব একত্রিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনী করে ফেলেছে। ওদেরকে স্বতন্ত্র না করা পর্যন্ত মুক্তি নেই।

ঃ তোমারও কি তাই ধারণা?

ঃ আমার ধারণায় কিছু যায় আসে না। সমগ্র জাতি একদিকে, আমি অন্যদিকে চিন্তা করব কোন যুক্তিতে।

ঃ আমরা এখানে মহল্লায় মহল্লায় বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বোম্বাইওয়ালা মোট কথা যত রকমের অবাঙ্গালী আছে তাদের বাড়ী ঘরে গিয়ে হামলা করছি। যাকে পাচ্ছি তাকে মারছি। আত্মরক্ষার্থে তারাও তাদের যার যা কিছু আছে তা দিয়ে প্রতিরোধ করছে আর এটাকে রং চড়িয়ে বি. বি. সি. থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে আমাদের এখানে রাস্তায় রাস্তায়, ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলছে। কি চমৎকার!

ঃ তুমি বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীদের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করতে চাও

ঃ পাগল! আমি কি তাই বলছি!

ঃ তবে!

ঃ আমি বলছি যে আমরা নেতার হুশিয়ারী ভুলে যাই কেন। শেখ সাহেব কি বলেছেন রেসকোর্সের মাঠে! কোন অবাঙ্গালীকে যেন আক্রমণ করা না হয়, তাতে আমাদের বদনাম হবে।

ঃ এত বড় একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম! ভুলত্রুটি তো কিছু থাকবেই।

ইত্যাকার কথাবার্তার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে থাকে রাহাত বশর শেখ ফরিদের চশমার দিকে। বিখ্যাত আউলিয়া শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাঃ) নাকি সাধনামগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদতে কাঁদতে চট্টগ্রামের এই ষোলশহর এলাকায় দু চোখের পানি ফেলে যে দুটি কূয়া সৃষ্টি করেছিলেন তা আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে অত্র এলাকায়। হাজার হাজার লোক আজো নাকি বিভিন্ন

রোগমুক্তি ও আশা পূরণের আশায় এই কূয়া দুটি থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এ কূয়া দুটিই এতদঞ্চলে সুপরিচিত শেখ ফরিদের চশমা নামে। শেখ ফরিদের চশমা সংলগ্ন রেল লাইন থেকে বেশ খানিকটা দূরে পশ্চিম দিকে সবুজ পাহাড়ী সমতল ভূমিতে পাকিস্তান যুগের প্রথম দশকে গড়ে ওঠা বসত ঘরগুলোর মধ্যে বশরদের বাড়ী। বশরদের বাড়ী প্রথমে ছিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ যে জায়গায় স্থাপিত হয়েছে সেখানেই। সরকার তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে বর্তমান নাসিরাবাদ এলাকায় বসতির জন্য তাদের জায়গা দিয়েছে। ঝোপ ঝাড়, জঙ্গল জলাভূমি ও কচুবনে ভরাট ছিল আগে এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি। এখন এখানে গড়ে ওঠেছে কত সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ী। কত জায়গা থেকে কত লোক এসে বসতি স্থাপন করেছে এই তল্লাটে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের যেখানে আজ প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের রোগ শোকাতুর আর্ত মানুষের চিকিৎসার্থে আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র সেখানে ছিল এক সময় গহীন বনভূমি। লোক বসতি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। হেঁড়া কয়েকটি বাড়ী ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো ছিল এখানে ওখানে। বশরদের বাড়ীও তন্মধ্যে একটি। উচুঁ পাহাড়ী টিলায় একবার একটি চিতাবাঘও ধরেছিল এখানকার অধিবাসীরা। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বশরের বাবা ছালামত সাহেব। ছালামত সাহেব ছিলেন এ এলাকার মাতব্বর গোছের লোক। সবাই তাকে গণ্যমান্য করত। সালিশে বিচারে সবাই শরণাপন্ন হত ছালামত সাহেবের। বিদ্যাবুদ্ধি লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন চৌকস। মসজিদে ইমামতি করতেন। আর করতেন ছোটখাট একটি মুদির দোকান। বৃটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী গঠন করে। ছালামত সাহেব ছিলেন মেহেদীবাগের আঞ্চলিক কমাডার।

রাহাতকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ছুটে আসে বশর পত্নী নাসরীন। রাহাতকে দেখে অন্দর মহলে চলে যেতে চাইলেই বশর ডাকে নাসরীনকে।

ও রানী, শোন। কোথায় যাচ্ছ? একে চেন না? ওহ্হো, তুমি তো আবার ওকে আগে কখনো দেখনি।

নাসরীন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টেনে অপাংগে দৃষ্টিতে রাহাতের দিকে তাকায়। রাহাতই কথা বলে নাসরীনের আড়ষ্টতার আবরণ অপসারিত করে দেয়।

ঃ দেখুন, ভাবী। আপনি আমাকে ইতিপূর্বে দেখেননি সত্যি, কিন্তু আপনার স্বামী আমার বাল্যবন্ধু। আমরা এক সঙ্গে প্রাইমারী থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। আপনাদের বিয়েতেও শরীক হয়েছি। কিন্তু পরবর্তীতে আপনাদের বাসায় কখনো আর আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক এক জন এক এক দিকে এক এক কাজে ব্যস্ত থাকতাম বলে কারো বাসায় কারো যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্য দোকানে টোকানে বশরের সঙ্গে আমাদের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হত।

আলতো করে শাড়ীর আঁচল থেকে হাত বের করে সালাম করে নাসরীন রাহাতকে। সালামের জবাব দেয় রাহাত। বশরকে লক্ষ্য করে নাসরীন বলে-

ঃ ওদেরকে তো কোনমতেই সামলানো যাচ্ছে না।

ঃ এখনো কাঁদছে!

ঃ হ্যাঁ। শেষ রাতে কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেও এখন আবার শুরু করেছে কান্না।

ঃ না কেঁদে কি পারে! চোখের সামনে বাপ ভাই, স্বামী পুত্রকে হত্যা করতে দেখে কেউ কি আত্মস্থ থাকতে পারে!

বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করেন বশরের আব্বা ছালামত সাহেব। কেউ যেন ধাক্কা মেরে বিস্ময়াবিষ্ট করে ফেলে রাহাতকে। চোখের পাতা রূপ নেয় অপলক ছবিতে।

ঃ আপনি! আপনি! চাচা ----

ঃ এ্যাঁ। একটু আগে আপনার সঙ্গে না আমার দেখা হয়েছিল রাস্তায়!

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু---।

ঃ কেন, চিনতে পাচ্ছ না আব্বাকে?

ঃ তোমার আব্বা!

ঃ হ্যাঁ, ছাত্র জীবনে কতবার দেখেছ আমাদের পুরনো বাড়ীতে। ---- আব্বা, একে চেনেন নাই? আমার বাল্যবন্ধু রাহাত। মোহসীনিয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় আমাদের বাড়ীতে সবসময় আসা যাওয়া করত।

ঃ কি জানি, বাপু। মনে নেই। বুড়ো হয়েছি তো। স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে।

ছালামত সাহেবের স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে গেলেও রাহাতের স্মৃতির গায়ে যে বিস্মৃতির পুরু আবরণ পড়ে জীবনের মধ্যাহ্নে অতীত যে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে তা রাহাতের কল্পনারও বাইরে ছিল। কত সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আগে ছালামত সাহেবের। গাট্টাগোট্টা পোলাদের মত মজবুত শরীরটা এখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। না আছে আগের সেই চেহারার জৌলুস। না আছে সেই কন্ঠের দৃঢ়তা। মুখভর্তি কালো দাড়িগুলো হয়ে গেছে সাদা ধবধবে। সময় পাল্টে দেয় মানুষের শরীরের মানচিত্রের রূপ। শ্লথ হয়ে গেছে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রাক পাকিস্তান যুগের লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের আঞ্চলিক কমান্ডার ছালামত সাহেব আজ জীবন সায়াহ্নে উপনীত এক অথর্ব বৃদ্ধ।

ঃ চাচা কি যেন বললেন। কার বাপ ভাইকে হত্যা করেছে? কারা করেছে?

ঃ ওই যে ভুতুড়ে বাড়ীর মত খালি বাড়ীগুলি তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলে সেখানে "মা শা আল্লাহ" একটি বিল্ডিং এর নাম ছিল। সেই বিল্ডিং এর মালিক হাজী ওয়াকিল সাহেব ও তাঁর একটি ছেলেকে দুষ্ট লোকেরা মেরে ফেলেছে। বাড়ী ঘরের সমস্ত মালামাল লুঠতরাজ করে নিয়ে গেছে। ওই হাজী সাহেবের স্ত্রী, মেয়ে কোন মতে পালিয়ে আব্বার কাছে আসলে আব্বা তাদেরকে আশ্রয় দেন। তারাই কান্না কাটি করছে।

ঃ হ্যাঁ, তাদের লাশও আছে ওই লাশগুলোর সঙ্গে। কবরও দেয়া হয়নি। বড় নেক বখত লোক ছিলেন হাজী সাহেব। আমার মত বুড়া। এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিলো বাড়ীতে। বড় দুই ছেলে একজন থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে, অন্যজন গেছে জাপানে। হাজী সাহেব আমাদের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

পড়তেন। কোন কাজকর্ম করতেন না। কারো সাতেও ছিলেন না, পাঁচেও ছিলেন না। দান খয়রাতও করতেন।

বলতে বলতে ঘরের বের হয়ে যান ছালামত সাহেব। স্তব্ধ হয়ে রাহাত বসে থাকলে বশর ডাকে নাসরীনকে।

ঃ নাসরীন, রাহাতকে একটু চা-টা দেবে না!

ঃ আসি।

ক্ষণকাল পরে ট্রে হাতে চানাস্তা নিয়ে পুনরায় আগমন ঘটে নাসরীনের। অনেকটা স্বাভাবিক। অনেকটা আত্মস্থ এখন নাসরীন। আগের সেই জড়তা ক্লিষ্ট ঘোমটা নেই এখন নাসরীনের। তবে মাথার কাপড় এখনও আছে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় রাহাতকে। ঠোঁটের আগায় মধুর পেয়ালা থেকে চুবিয়ে আনা হাসির এক টুকরা হালকা আস্তরন।

ঃ নিন ভাই, একটু চা নিন।

ঃ আপনাদের কষ্ট দিতে এলাম।

ঃ ছি, কি যে বলেন!

খুব ভাল লাগল নাসরীনকে রাহাতের। সাক্ষাৎ বাঙ্গালী গৃহবধূর মূর্তিমতী প্রতীক। এতটুকু আতিশয্যের বালাই নেই কোথাও। তবুও যেন মনে হয় ঐশ্বর্যময়ী।

ঃ আপনাদের বাচ্চাগুলো কোথায়, ভাবী?

ঃ বাচ্চারা বাইরে খেলা করছে বোধ হয়। ভাবীকে একদিন নিয়ে আসেন না, ভাই।

ঃ আনব। ---- আচ্ছা, বশর, হাজী সাহেবের স্ত্রী মেয়েরা কি কখনো তোমাদের এখানে আগে আসা যাওয়া করেছে?

ঃ না, এই প্রথম। আব্বাই ওদেরকে রাত্রে মসজিদ থেকে এশার নামাজ পড়ে আসার পথে মসজিদের গম্বুজের পাশে লুকিয়ে থাকতে দেখে নিয়ে এসেছেন। ---- নাসরীন, ওদেরকে ডেকে এখানে নিয়ে আস তো।

নাসরীন কক্ষান্তরে চলে যাওয়ার আধ ঘন্টা পরে হাজী ওয়াকিল সাহেবের স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে বশরদের ঘরে। বশর ও রাহাতের দুজোড়া চোখের দৃষ্টি এক সঙ্গে আছড়ে পড়ে ওদের ওপর। দুমড়ে মুচড়ে পিষে কেউ যেন থেতলে দিয়েছে মা ও মেয়েকে। বৃদ্ধা মহিলার নয়ন থেকে ঝরছে অনর্গল অশ্রুধারা। তরুণীর দৃষ্টিতে অসহায়ত্বের করুণ আকুতি। পাকা সাগর কলার খোসার মত গায়ের রং এখন হয়ে গেছে পচা কলার খোসার মত।

ঃ আপনারা কাঁদছেন কেন, চাচী!

বশরের প্রশ্নের সাথে সাথে আবার হু হু করে সশব্দে কেঁদে ফেলে বৃদ্ধা।

হামলোগ কা কেয়া হোগা, বেটা?

ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় বশর। কি জবাব সে দেবে! সে তো নিজেও জানে না যে কি অবস্থা তাদের হবে।

ঃআমরা এভাবে কদিন থাকব, ভাইয়া?

ঃ যদ্দিন পর্যন্ত দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে তদ্দিন পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, বোন।

নাসরীনের আশ্বাস বাক্যে সম্বিৎ যেন ফিরে আসে বশরের। তাইতো। এতটুকু সান্ত্বনা'তো সেও দিতে পারতো হাজী দুহিতাকে। কিন্তু সে তা পারেনি। দুজন মেয়ে লোকের অসহায়ত্ব কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছিল বশরকে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছিল সে তাদের প্রতি। আর রাহাত তো কালের সোপান থেকে পিছলে চলে গিয়েছিল তিন চার মাস পেছনে। হ্যাঁ, এ মেয়েটিকেই তো সে দেখেছিল তাদের কোম্পানীর এম ডি খলিল সাহেবের মেয়ের বিয়েতে। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল মেয়েটির রূপের জৌলুস দেখে। "ডানা কাটা পরী" যেসব মেয়ের বেলায় ব্যবহৃত হয় একে সত্যিই তাই মনে হয়েছিল সেদিন। কত মেহমানের সমাগম হয়েছিল সে বিয়েতে। নারী পুরুষ ছেলে মেয়েতে দু তিন হাজারের কম হবে না। সবাইকে ছাড়িয়ে এ মেয়েটিই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল অভ্যাগতদের। মিলের অফিসারদেরও দাওয়াত দিয়েছিলেন এম. ডি. সাহেব। রাহাতও তাই উপস্থিত ছিল সেখানে।

ঃ দেখছ রাহাত! ওই মেয়েটিকে দেখ।

কলিগ আবুল হোসেনের ডাক ও ধাক্কায় চমকে ওঠেছিল রাহাত। কয়েকশ মেয়ের মধ্যে এই হাজী দুহিতাকে মনে হয়েছিল সেদিন সাক্ষাৎ অপ্সরী।

ঃ আমিন জুট মিলের এম. ডি. সাহেবের মেয়ের বিয়েতে কিছুদিন আগে আপনিও কি ----?

ঃ জ্বি, হ্যাঁ। আমিও গিয়েছিলাম। এম. ডি. সাহেবের মেয়ে নাগমা আমার সহপাঠিনী ও বান্ধবী ছিল।

ঃ আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন কি করে?

ঃ আপনাদের এদেশে জন্ম নিয়েছি। এখানেই বড় হয়েছি। এখানেই লেখাপড়া করেছি।

আমিন ক্লাবের বিবাহানুষ্ঠানে দেখা সেদিনের সেই দৃষ্টিহরা মেয়েটিকেই যে আজকে এভাবে এখানে দেখবে রাহাত ভাবতেও পারেনি। ভাগ্য যে কখন কাকে কোথায় নিয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। একেই কি তাহলে বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

ঃ কিন্তু আমাদের অপরাধটা কি, ভাই? আমরা তো কারো কোন ক্ষতি করি নি। আব্বা বুড়ো মানুষ। ভাইটা ছোট। কলেজে পড়ত। কেন তাদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হল!

চার

সপ্তাহ দু সপ্তাহ পর আবার আনমনা হয়ে রাহাত বের হয় রাস্তায়। একবার ভাবে বশরদের ওদিকে যাবে। কি এক অদৃশ্য সূত্র যেন তাকে টানছিল সেদিকে। কিন্তু সেদিকে অগ্রসর না হয়ে সে হেঁটে চলেছিল আন্দরকিল্লার দিকে। দেওয়ান বাজার পার হয়ে খানিক যেতে না যেতেই সে দেখতে পেল বশর ঠেলাগাড়ী ভরে দোকানের মালামাল নিয়ে গৃহাভিমুখে যাচ্ছে। হাতে তার পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ। এক রাশ বিস্ময়ের ফাগ কে যেন মেখে দেয় রাহাতের মুখাবয়বে। এতদিন পর এ আবার কোন দৃশ্য! পথচারী সকলের চোখে মুখে সেই একই ভাব। কেউ কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথাও বলছে না। বাধাও দিচ্ছে

না কেউ। যে যার পথ ধরে চলছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে বশরের দিকে। এ পাকিস্তানীর আবির্ভাব ঘটল আবার কোত্থেকে? বোবা প্রশ্ন সবার দৃষ্টিতে। জিজ্ঞেস করে রাহাত।

ঃ ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, বশর, তোমার হাতে পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ?

ঃ পাকিস্তানী আর্মি সাজোঁয়া বহর, ট্যাংক ইত্যাদি নিয়ে বন্দর, ডবলমুরিং, রেয়াজুদ্দীন বাজার, কোর্ট বিল্ডিং সব দখল করে নিয়েছে। ওরা এখন বাটালী হিল থেকে শুরু করে কোর্ট বিল্ডিং এর ছাদ ও অন্যান্য বড় বড় বিল্ডিং এর ছাদে পজিশন নিয়ে বসেছে। সবখানে আবার পাকিস্তানী পতাকা ওড়ছে। সর্বত্র এক অজানা আতঙ্ক থমথম করছে চতুর্দিকে। আল্লাহ্ জানে কি হয়।----

ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে মানুষজন সব পালাচ্ছে, আমার কর্মচারীও বাড়ী চলে গেছে। যে কোন সময় দোকান লুঠ হতে পারে। তাই মালগুলো বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।

ঃ আপনার পাকিস্তানী পতাকাটা লুকিয়ে ফেলুন, অথবা ফেলে দিন। নতুবা বাঙ্গালী সৈন্যরা আপনাকে মেরে ফেলতে পারে। এখান থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত সবখানে বাঙ্গালী সৈন্যদের আধিপত্য।

অনেক পথচারীর মন্তব্যে হুঁশ ফিরে আসে বশরের। তাইতো। এটাতো বাংলাদেশ। এখানে ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা।

ঃ হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন।

বশর তাড়াতাড়ি পাকিস্তানী পতাকাটা গুটিয়ে ভাঁজ করে ঠেলাগাড়ীতে তার দোকানের মালগুলোর নীচে লুকিয়ে ফেলে। রাহাত পদচালনা শুরু করে আবার আন্দরকিল্লার দিকে। আন্দরকিল্লাস্থ জেমিসন ম্যাটারনিটি রেডক্রস হাসপাতালের ছাদের কোয়ার্টারে বসবাসরত তার বন্ধু ডাক্তার আলীর বাসভবনে গিয়ে হাজির হয়। ডাক্তার পত্নী তো রাহাতকে দেখে খুশীতে ডগমগ।

ঃ আরে, রাহাত ভাই যে! আসুন আসুন। মেলা অবসর পেয়ে বেড়ানো ছাড়া এখন আর কি করবেন!

ঃ কি খবর, রাহাত! তোমাদের ওদিককার খবর কি? আমরা তো আবার পাকিস্তানী হয়ে গেছি।

ডাক্তার আলী গল্প জুড়ে দেয় রাহাতের সঙ্গে। গতরাতে পাকিস্তানী আর্মির গোলাগুলিতে সারারাত যে ঘুমাতে পারেনি, সে কথা বলতেও ভুলেনি রাহাতকে। তারা ছাদের ওপর থেকে দেখেছে বাঙ্গালী সৈন্যরা সিরাজউদ্দৌলা রোড ধরে উত্তর দিকে চলে গেছে। প্রতিরোধ করতে পারেনি পাকিস্তানী আর্মিদের। আর করবেই বা কি করে! পাকিস্তানী আর্মিদের রয়েছে ট্যাংক, কামান, মেশিন গান থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের ভারী অস্ত্র। বাঙ্গালী সৈন্যদের তো সেসব নেই। গাদা বন্দুক দিয়ে তো কামানের মোকাবেলা করা যায় না। পাগলের মত প্রাণ দেয়ার মধ্যে তো কোন বাহাদুরী নেই।

ঃ আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে, রাহাত ভাই। হাঁস জবাই করে রান্না করেছি।

ডাক্তার পত্নীর কথায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রাহাত। এমন সুস্বাদু হাঁসের গোশতের লোভ ত্যাগ করে কি সে যেতে পারে! অসম্ভব ভাল লাগে ডাক্তারপত্নীকে রাহাতের। সমগ্র চেহারা সুরতে কেমন যেন এক অদ্ভুত মায়ার অতনু প্রলেপ লেপটানো। দেখলেই শ্রদ্ধা কিংবা আদর করতে উন্মথিত হয়ে ওঠে অন্তরের বাসনা। একমাত্র শিশু সন্তান ফরহাদ আর ওরা স্বামী স্ত্রী তিনজনের ছোট্ট একটি সংসারে না আছে কোন প্রকার সংসারের জটিলতা, না আছে বাইরের ঝঞ্ঝাট। অথচ এই জেরীনকে আদৌ বিয়ে করার ইচ্ছে ডাক্তার আলীর ছিল না। কত মেয়েই তো ডাক্তার আলীকে নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছে! পেয়েছে কি? মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় কন্ট্রাক্টার দুহিতা ঝর্ণার ছোট ভাই তৌফিককে পড়াতে যেত আলী ঝর্ণাদের বাড়ীতে। ঝর্ণা তখন চট্টগ্রাম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ভরা যৌবনের টালমাটাল বন্যায় প্রতিটি অঙ্গ তার টইটম্বুর। নিজেদেরই অজান্তে কোন্ এক চুম্বকের আকর্ষণে আলী আর ঝর্ণা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে যেতেই বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় ঝর্ণার। আলীকে তার পেতেই হবে। আলী ব্যতীত তার জীবন ব্যর্থ। কিন্তু আলী! আলীর পক্ষে কি সম্ভব ঝর্ণার মত মেয়ের খেয়াল খুশীর কাছে নিজকে সঁপে দেয়া! সে যে এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। রেলের কর্মচারী ভাইয়ের আশ্রয়ে থেকে ডাক্তারী পড়ছে। প্রতিষ্ঠিত হতে এখনো

অনেক দিন বাকী। কি করে সে প্রাচুর্যের ঝিলে অবগাহিত কন্ট্রাক্টার দুহিতাকে জীবন সঙ্গিনী করে নিতে পারে!

ঃ তোমার তো ভয়ের কিছুই নেই, বাবা। আমরা তো আছি। তোমার সব দায়িত্ব আমরাই নেব।

কন্ট্রাক্টার ও কন্ট্রাক্টার-পত্নীরও একান্ত ইচ্ছে আলীর মত একটি ছেলেকে তাঁরা জামাই হিসেবে পান। কিন্তু আলী পারেনি নিজের ভাই-ভাবী ব্যতীত অন্য কারো গলগ্রহ হতে। তাই সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে ওখান থেকে।

ঃ জান, রাহাত, আমি কেন যেন নিজকে সম্বরণ করতে পারতাম না ঝর্ণাকে দেখলে। আমার সমস্ত শরীরের শোণিত উর্মিমালা উত্তাল হয়ে যেত ওর স্পর্শের জন্য। ওর তুলতুলে বুকের আলিঙ্গনে বিদ্যুৎ বয়ে যেত আমার শিরা উপশিরায়। বড় কষ্টে আমি ওদের টিউশনি ছেড়ে বেঁচেছি।

অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আলীর জীবনের অনেক কিছুই রাহাতের অজানা নয়। রাহাত তো জানে প্রতিবেশিনী সুলতানা, সহপাঠিনী সুস্মিতা চাকমা প্রমুখ কিভাবে আলীকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। সবাই বলতো আলী নাকি লেডি কিলার। মেয়েরা তার সান্নিধ্যে গেলেই কেমন যেন তার প্রতি দুর্বল হয়ে যেত। কি এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে তারা তার সাহায্য কামনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারত না। যেমনি পারেনি আলীপত্নী জেরীনও। একদিন এই জেরীনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিল রাহাতও। তখন সবেমাত্র ইন্টারনী ডাক্তার হয়ে এই কোয়ার্টারে আলী এসেছে। রাহাত গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে।

ঃ দেখেছ মেয়েটিকে?

ঃ কোন্ মেয়েটি?

ঃওই যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল।

ঃ ও! সালোয়ার কামিজ পরা, পাতলা পোতলা গড়ন ফর্সা মেয়েটি?

ঃ হ্যাঁ, ওটি ডাক্তার শাহেদার বোন। আমার সামনের বাসাতেই থাকে।

আলী আর ডাক্তার শাহেদার বাসা দুখানা ছাদের দুপ্রান্তে। মধ্যখানে বিরাট ফাঁকা চত্বর। আলী আর জেরীনের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত এই চত্বরেই। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে পরিচয়। আর এই পরিচয় পরবর্তীতে গাঢ় হতে হতে রূপ নেয় প্রণয়ে। ইতস্ততঃ করতে থাকে আলী। অন্ধকার দেখে দুচোখে। কি করে সে পরিণয়ে আবদ্ধ হবে এখন জেরীনের সঙ্গে। এখনো তো সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন চিরকুমারী ডাক্তার শাহেদা।

ঃ পেয়েছেন কি আপনি আমার বোনকে? বিয়ে করতে না পারলে এত ঘনিষ্ঠ হয়েছেন কেন ওর সঙ্গে? আপনি পেয়েছেন কি? আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। কালই আপনার বড় ভাইকে ডেকে আনবেন।

ডাক্তার শাহেদার দৃঢ়তায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল ডাক্তার আলী। ইতিপূর্বে অনেক মেয়ের সঙ্গে আলীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কোন মেয়ে কিংবা কোন মেয়ের গার্ডিয়ানের প্রেশারে এমনভাবে কুপোকাৎ আলীকে হতে হয়নি। হতে হয়নি এমনভাবে অপদস্থ। নাছোড়বান্দা ডাক্তার শাহেদা। কোন যুক্তির কাছেই তিনি মাথা নোয়াতে প্রস্তুত নন। বিয়ে করতেই হবে ডাক্তার আলীর জেরীনকে। অথচ ঝর্ণার বাপমাও কি চেষ্টার কম ক্রটি করেছেন আলীকে জামাই হিসেবে পেতে! কিন্তু পেরেছেন কি তাঁরা আলীকে বাগে নিতে? এমন কি সুস্মিতাও তো কম কান্নাটা কাঁদেনি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের গার্লস হোস্টেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পাহাড়ের সবুজ পাদদেশের এক কোণায় ঝোপের আড়ালে গা ঘেঁষে বসে কত না-বলা কথাই না তারা সেদিন বলাবলি করেছিল। স্নিগ্ধ মধুর বিকেল। সূর্য অস্ত যেতে তখনো ঘন্টাখানেক বাকি। ছড়িয়ে পড়েছে বিকেলের মিষ্টি আলো চারদিকে।

ঃ তুমি বিশ্বেস কর, আলী, তুমি ছাড়া আর কারো কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।

আলীর গলা জড়িয়ে মন উতলা করা মদির কণ্ঠে কথা কটি যেন আলীর মরমে পৌঁছে দিয়েছিল সুস্মিতা। পুষ্ট বুকের কপোতদ্বয় শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আলীর বুকে খেলা করছিল সেই সাথে।

আলীর স্থিরতা যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল অদৃশ্য ঝড়ের ঘাত প্রতিঘাতে। তবুও বলেছিল মুখে-

ঃ তোমাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, মিতা। পড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তো কিছু করা যায় না।

ঃ তুমি কাপুরুষ! তোমাকে চয়েস করেই আমি ভুল করেছি।

কেঁদে কেঁদে একাকার করে ফেলেছিল সুস্মিতা। তার গৌরবর্ণের মুখমন্ডল রক্তিম হয়ে গিয়েছিল রাগে অপমানে। সেসব কথা আজো ভুলেনি আলী। আলী আজ ডাক্তার হয়েছে সত্যি, কিন্তু এখনো পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাতেও দুঃখ করে না জেরীন।

ঃ তুমি ভয় পেও না। ধীরে ধীরে আমরা গড়ে তুলব আমাদের সংসার। একদিনে তো আর সব কিছু হয় না।

জেরীন আশ্বস্ত করেছে ডাক্তার আলীকে।

খাওয়া দাওয়া করে গল্প গুজব করতে করতে বেলা অনেক দূর গড়িয়ে যায়। এক সময় শোনা যায় গোলাগুলির শব্দ ও কামানের গর্জন।। রাহাত চিন্তিত হয়ে পড়ে তার বাড়ী ঘরের জন্য। গোলাগুলির শব্দ আসছে তার বাড়ীর ওদিক থেকে।

ঃ ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না আলী। বাড়ীতে মেয়েটাকে নিয়ে সামিনা একা। ভীষণ ভয় করছে আমার। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদিকে।

আলী, রাহাত, জেরীন সবাই ঘর থেকে বের হয়ে চত্বরে আসতেই দেখতে পায় উত্তরাকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অস্থিরতা রাহাতকে অধৈর্য করে তোলে। না, আরেক মুহূর্তও অপেক্ষা করা তার জন্য সমীচীন হবে না। বেরিয়ে পড়ে সে আলীর ওখান থেকে।

ঃ রাহাত ভাই, খুব সাবধানে যাবেন। আমারও কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।

জেরীনের সাবধানবাণী নিয়ে বাসার দিকে অগ্রসর হয় রাহাত।

পাঁচ

পথে নেমেই কেমন যেন সমস্ত শরীরের বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে যায় রাহাতের। পা বাড়াতেই হোঁচট খেয়ে পড়বার উপক্রম। এ কোথায় এসে পড়ল রাহাত! চিরপরিচিত পথ কি এটি সেটিই! বন্দরনগরী চট্টলার যানবাহন ও পথচারীতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ সিরাজউদ্দৌলা রোড কি এটি! সন্দেহ হয় রাহাতের। পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামের মুখর রাজপথ চিরচেনা সিরাজউদ্দৌলা রোডকে স্বপ্নের দেশের অন্যপথ বলে মনে হয় রাহাতের। চব্বিশ ঘন্টা যে পথে চলাচল করে হাজার হাজার লোকজন ও যানবাহন সেপথ কি করে হঠাৎ এমন নিস্তব্ধতার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে তা রাহাতের বোধগম্য হয় না। বোধগম্য হয় না রাহাতের সে এ কোন দেশে এসে পড়ল। সকালে কি সে এ পথ দিয়েই ডাক্তার আলীর ওখানে গিয়েছিল! পা চলতে চায় না রাহাতের। কোন্ এক অশরীরী ভীতির দৈত্য যেন টুঁটি চেপে ধরছে তার। রক্ত স্রোত হিম হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। দৃষ্টি যেন প্রতিহত হচ্ছে ধোঁয়াটে কুয়াশার পাতলা জালে। নিজঝুম জনমানবহীন সিরাজউদ্দৌলা রোড। একটা মশার ভনভনানি পর্যন্ত শ্রুত হচ্ছে না কোথাও কোন দিক থেকে। চারদিকে গাঢ় থমথমে ভাব। রাস্তার দু পাশের দোকানপাট ঘর বাড়ী সব বন্ধ। কোথাও কোন কিছুর নড়চড় পর্যন্ত নেই। এ পথ দিয়ে একা হাঁটতে গা ছমছম করে রাহাতের। সে কি যাবে, না, যাবে না। দোদুল্যমানতা পেয়ে বসে রাহাতকে। এ রকম হল কেন? হঠাৎ কোন্ দৈত্য এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে গেল সব আলো বাতাস! সব চৈতন্য হারিয়ে গেছে জড়তার নির্জীবতায়। জোর করে টেনে টেনে নিয়ে যায় রাহাত পা দুখানাকে। আশপাশের অলি গলি থেকেও পাওয়া যায় না কোন প্রাণের সাড়া শব্দ। যেসব ঘর বাড়ীতে সকালে আলী দেখে গেছে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পেতে, সেখানে এখন কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তবুও রাহাত পথ চলে। এগিয়ে যায় তার বাড়ীর দিকে। তাকে যেতেই হবে। কে জানে কি অবস্থায় আছে তার স্ত্রী সন্তান। তার কন্যা আঁখির জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাহাতের। কে জানে কি করছে এখন সামিনা ও আঁখি। বেঁচে আছেতো! হঠাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে রাহাতের বুক। দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে

যায়। না, না, বেঁচে তাদের থাকতেই হবে। তার সামিনা! তার আঁখি! তার কলজের টুকরা! না, না, আর ভাবতেই পারে না রাহাত। কে যেন আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ধরছে। ছাড়াতে পাচ্ছে না সে শত চেষ্টা করেও। আড়ষ্ট হয়ে আসছে হাত পা থেকে শুরু করে শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি। বুকের ভেতরকার ধুক্ ধুকানি দেহটাকে যেন আছড়ে ফেলছে মাটিতে। তবুও এগোয় রাহাত। কে যেন একজন উঁকি দিল ঈষৎ দরজা ফাঁক করে রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি ঘর থেকে। রাহাত তার কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা চিন্তা করার আগেই আবার বন্ধ করে দিল দরজা। এ কেমন আচরণ কিছুই উপলব্ধিতে আসছেনা রাহাতের।

সিদার মার্কেট পার হয়ে চন্দনপুরাস্থ দারুল-উলুম আলীয়া মাদ্রাসার নিকটবর্তী হতেই থমকে দাঁড়ায় রাহাত। দুজন লোক একজন আহত জখমীকে কাঁধে করে আসছে তার দিকে। কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করে রাহাত-

ঃ ব্যাপার কি, ভাই? উনার এ অবস্থা কি করে হল?

আহত লোকটার কোন সাড়াশব্দ নেই। মারা গেছে, না, বেঁচে আছে তাও বোঝবার উপায় নেই। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি সব রক্তে রঞ্জিত। তার বাহক লোক দুটির একটি জবাব দিল-

ঃ চকবাজারের ওখানে গুলিতে আহত হয়েছে।

ঃ গুলি কোত্থেকে আসল, কে গুলি করেছে?

ঃ অত কথা বলার সময় আমাদের নেই।

লোক দুটি চলে গেল আহত লোকটিকে নিয়ে। রাহাত স্থাণুবৎ ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার অগ্রসর হয় সামনের দিকে। ভূতুড়ে নগরীর ভূতুড়ে রাজপথে একমাত্র পথচারী রাহাত। পা দুখানাকে কে যেন সেঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। কোন মতেই যেন তোলা যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে টেনে চলে রাহাত। প্যারেডের মাঠ পার হয়ে চকবাজারে গিয়ে পৌঁছুতেই যেন আকাশ থেকে পড়ে রাহাত। এত বড় বাজার, যেখানে অহর্নিশ গম গম করে হাজার হাজার লোক সেখানে কেবল দুচারজন লোক যেন লুকোচুরি খেলছে।

এদিক থেকে উঁকি দিলে একজন, আরেকজন উঁকি দেয় অন্যদিক থেকে। কোনমতে একজনের কাছাকাছি হয়ে সানুনয়ে জিজ্ঞেস করে রাহাত।

ঃ বিষয় কি, আমাকে একটু খুলে বলুন তো, ভাই। আমি তো এখানে ছিলাম না। আন্দরকিল্লার ওদিকেই ছিলাম। এসে দেখি এ চকবাজার সে চকবাজার নেই।

ঃ থাকবে কি করে, এখানে যে কেয়ামত হয়ে গেছে।

ঃ এ্যাঁ!

ঃ হ্যাঁ। সত্যিই কি আপনি কিছুই জানেন না?

ঃ না, ভাই। সত্যি বলছি, আমি ছিলাম না। আমি গেছিলাম আন্দরকিল্লায়।

ঃ উহ্! আর বলবেন না। ঘন্টা খানেক আগে পাকিস্তানী মিলিটারীরা সাঁজোয়া বহর ও ট্যাংক নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে এসে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। ---- আপনি যাবেন কোথায়?

ঃ আমি গুলকবহরেই যাব।

ঃজানি না ওখানকার অবস্থা কি রকম। এখানে তো অনেকগুলো ঘরবাড়ী কামানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে কাঁচা ঘরবাড়ী।

ধক্ করে ওঠল রাহাতের বুকের ভেতরটা। সে কি করবে এখন! কাঁপতে থাকে তার সমস্ত শরীর। কি করে সে তার স্ত্রী কন্যার কাছে যাবে। ভেবে পায় না রাহাত। এ সময় কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা মওলানা গোছের এক লোক এসে উদিত হয় রাহাতের কাছে। পরনে লম্বা কোর্তা পায়জামা। মাথায় গোল টুপী। জিজ্ঞেস করে রাহাতকে-

ঃ আপনি কোথায় যাবেন, ভাই?

ঃ আমি গুলকবহরে যাব।

ঃ কি করে যাবেন? চারদিকে পাকিস্তানী মিলিটারীরা ঘিরে রেখেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাসায় যাওয়ার পথ পাচ্ছিনা।

ঃ আপনি কোথায় যাবেন?

ঃ আমি মেহেদীবাগ যাব।

ঃ চলুন না অলি খাঁ মসজিদের ওদিক দিয়ে কোনমতে যাওয়া যায় কিনা। হাউজিং সোসাইটির মধ্য দিয়ে পাঁচলাইশ থানার পেছন দিক থেকে সামনের রাস্তায় পৌঁছে আপনি চলে যাবেন পশ্চিম দিকে। আমি চলে যাব উত্তর দিকে। বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। ওদের চোখে পড়লে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। অলিগলি খুঁজে যেতে হবে।

লোকটাকে নিয়ে আবার বের হয় রাহাত রাস্তায়। অলি খাঁ মসজিদের কাছে যেতেই দেখা হয় মসজিদের মোয়াজ্জেনের সঙ্গে। আসরের আজান দেয়ার জন্য তিনি বের হয়েছেন ঘর থেকে।

ঃ হুজুর, এ রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে?

ঃ জানি না, ভাই। আমাদের ওপর দিয়ে ছানি কেয়ামত হয়ে গেছে। মসজিদের ওপর দিয়ে বৃষ্টির মত কামানের গুলি গেছে। আল্লাহর রহমত যে গম্বুজে লাগেনি। লাগলে মসজিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেত।

রাহাত মসজিদের সামনেকার রাস্তা দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় কাতালগঞ্জ বটগাছের কাছে একখানা ট্যাংক দাঁড়ানো। তার চার পাশে পায়চারী করছে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য। শরীরের রক্ত স্রোত আবার বন্ধ হয়ে যায় রাহাতের। বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায় হাত পা। ফ্যাকাশে হয়ে যায় সমস্ত চেহারা সুরত।

ঃ এত ঘাবড়ালে তো চলবে না। চলুন না মেডিকেল কলেজের সামনের আবাসিক এলাকা হয়ে আমরা পাঁচলাইশ থানার ওদিকে গিয়ে দেখি কি অবস্থা।

সঙ্গী মওলানার কথায় মনের বল ফিরে আসে রাহাতের। নিরাশ হলে তো চলবে না। ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মওলানা সাহেবের সঙ্গে রাহাত ঢুকে পড়ে আবাসিক এলাকায়। এলাকাটি পার হয়ে পাঁচলাইশ থানার পার্শ্বস্থ রাস্তায় পা দিতে না দিতেই শুনতে পায় গুরুগম্ভীর ডাক।

ঃ হল্ট্।

চমকে ওঠে রাহাত ও মওলানা। দেখতে পায় তাদের দিকে তাক করে আছে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যের রাইফেল। আর রক্ষা নাই। এইবার নির্ঘাত তাদের মৃত্যু। ওপরের দিকে হাত তুলে কলেমা পড়তে থাকে দুজনেই। অন্ততঃপক্ষে যেন কলেমা মুখে তারা মরতে পারে। শব্দ করে জোরেসোরে কলেমা পড়েন মওলানা সাহেব।

ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্।

ঃ চলো।

রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ওদেরকে নিয়ে যায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পাঁচলাইশ থানার সামনের রাস্তায়। রাস্তার পাশে আরো চার পাঁচজন নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে বসিয়ে রেখেছে ওরা। মওলানা সাহেব ও রাহাতকেও নিয়ে গিয়ে জড় করে ওখানে। ওদের আর বুঝতে বাকী থাকে না যে একটু পরে ওদেরকে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হবে। মওলানা সাহেবের মুখে উঁচু স্বরে কলেমা শুনে সবাই কলেমা উচ্চারণ করতে থাকে জোরেশোরে। ওদের অবস্থা দেখে হাবিলদার ধরণের জনৈক পাকিস্তানী সৈন্য বলে ওঠে-

ঃ কলেমা পড়নেকী জরুরত নেহি। আভি কেঁও কলেমা পড় রাহে হো। জয় বাংলা বলো, জয় বাংলা।

তবুও উচুঁ স্বরে আর্তনাদের মত কলেমা পড়তে থাকে ওরা। হাবিলদারের মত সৈন্যটা এবার ধমক দেয় ওদের।

ঃ খামোশ রহো। হাম ভী মুসলমান হেঁ। কলেমা কেঁউ সোনা রহে হো হামকো। কলেমা সোনা কর বাঁচনে চাহতে হো।

ঃ ওস্তাদ, খতম কর দো।

ঃ নেহী। যাও, তোম।

কাঠখোট্টা ধরণের জনৈক সৈনিক গুলি করতে চাইলে তাকে বারণ করে হাবিলদারটা।

ঃ তোম লোগ মে কোই পুলিশ কা আদমী হ্যায়?

ঃ না, স্যার। আমরা কেউ পুলিশের লোক নই। আমরা গরীব মানুষ। কাজ কর্ম করে খাই।

সমস্বরে সবাই জবাব দেয়। তবুও সন্দেহ কাটে না যেন হাবিলদার সৈনিকটার। শ্যেন দৃষ্টিতে তাকায় সে সবার দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে কি যেন খোঁজে প্রত্যেকের মধ্যে।

ঃ কোই হিন্দু হেয়।

ঃ না, ভাই, আমরা কেউ হিন্দু নই। আমরা সবাই মুসলমান।

এবারও সবাই উত্তর দেয় এক সঙ্গে। তবুও ভয়ের কালো মেঘ কাটে না যেন ওদের। কাঁপতে থাকে ওদের সমস্ত শরীর থরথর করে। যেকোন মুহূর্তে সৈনিকগুলোর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওদের বুক। শুধু সময়ের অপেক্ষা। নিশ্চিত মৃত্যু যেন হাবিলদারটার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সম্মুখে। কলেমা পড়া তবুও স্তব্ধ হয় না তাদের। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মওলানা সাহেবটা সাহস সঞ্চয় করে ঢিপ্ ঢিপ্ বুক নিয়ে বলে-

ঃ ভাই, আসর কী নামাজ পড় সেকতা হেয়।

মওলানা সাহেবের মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিক চেয়ে থেকে কি যেন ভাবল হাবিলদারটা। তারপর বলল।

ঃ যাও।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পার্শ্ববর্তী জনমানবশূন্য একখানা বাড়ীর দিকে। মওলানা সাহেব গেট দিয়ে বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অন্যরা সব বসে থাকে। হাবিলদারটা এবার তাদেরও হুকুম দেয়।

ঃ যাও, তোম লোগ ভী যাও।

দৌড়ে সবাই পাকিস্তানী সৈন্যগুলোর দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। রাহাতসহ সকলেই দ্রুত পদে বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা। কোন লোকজনের নাম নিশানা পর্যন্ত নেই কোথাও। দোতলা সুন্দর বাড়ীটার কোথাও কোনখানে একটি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। চার দিকে প্রাচীরবেষ্টিত শূন্য বাড়ীটার বাউন্ডারী দেয়াল সংলগ্ন ফুলের বাগানে

ফুটে আছে রকমারী ফুল। পানির টেপও আছে পাশে। নীচের তলার দুটি কক্ষের দরজায় সাদা কাগজে ইংরাজীতে লেখা "বার্মিজ মুসলিম" দেখা গেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু কোন লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না। দক্ষিণ দিকে দেয়াল ঘেঁষে ইট, পাথর, লোহা ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর স্তূপ বলে দেয়, বাড়ীটা আরও ওপরের দিকে ওঠে তিন চার তলায় রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। রাহাত এবং আরও কয়েক জন বাগানের টেপে অজু করে মওলানা সাহেবের ইমামতিতে আসরের নামাজ আদায় করে মুহূর্ত গুণতে থাকে মৃত্যুর জন্য। সঙ্গী বৃদ্ধ লোকটি হুহু করে কেঁদে ফেলে।

ঃ আমাকে মেরে ফেললে আমার মেয়েটির কি হবে! ঘরে যে আমার সোমত্ত মেয়ে। ওকে দেখার আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই।

ঃ কাঁদবেন না, চাচা। আল্লাহ্কে ডাকেন, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

রাহাত কোন মতে সান্ত্বনা দেয় বুড়াটাকে। কিন্তু তারও ভেতরটা হু হু করছে তার স্ত্রী কন্যার জন্য। বেলা বয়ে গেছে অনেক। সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকী নেই।

ঃ হেই চলো।

জনৈক সৈনিক এসে গর্জন করে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। ভয়ে ভয়ে অসহায় লোকগুলো কাঁপতে থাকে পুনরায়। সকলের রক্ত হিম হয়ে জমাট বেঁধে যায় যেন। চলচ্ছক্তি নেই কারো। কি করে অগ্রসর হবে তারা! সৈনিকটার রাইফেলের গুঁতায় তবুও বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। চতুর্দিকে তাকিয়ে পৃথিবীটাকে একবার দেখে নেয় রাহাত। হয়ত এখুনি তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। রাহাত দেখতে পায় পাহাড়ের চূড়ায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পজিশন নিয়ে আছে। হাবিলদার সৈনিকটা বলে-

ঃ যাও, তোম লোগ চলে যাও। কাঁহি ঠেরোগে নেহী। আগর দুসরা কিসিকী নজরমে আয়েগা তো তোম কো মার ঢালেগা।

ঃ ওস্তাদ। ইয়ে লোগ কো ছোড় দেঁতে?

যে সৈনিকটা রাহাতদের ওই পোড়ো বাড়ীটা থেকে রাইফেল দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বের করে এনেছিল সে অবাক হয়ে যায় হাবিলদারের কাণ্ড দেখে।

ঃ হ্যাঁ। ইয়ে লোগ কো মারনেছে কেয়া ফায়দা! ইয়ে লোগ তো হামারা সাত লড়তা নেহী।

রাহাত ও তার সঙ্গী লোকগুলো যে যেদিকে যাওয়ার দ্রুতপদে চলে যায়। রাহাত দেখে রাস্তার উভয় পাশের অনেক ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানী সৈনিকরা। পোড়ানীতি অনুসরণ করেছে তারা। রাহাত ধীরে ধীরে বাড়ীর রাস্তা ধরে এগোয়। সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে যায় সে। ঘরে পা দিতে না দিতেই সামিনা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে রাহাতকে । কেঁদেকেটে একাকার করে ফেলে।

ঃ তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তোমার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে একটু আগে। কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম! এক একজন এক এক কথা বলছিল। আল্লাহ্‌র হাজার শুকর যে আল্লাহ্ আবার তোমাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ছয়

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে না আসতেই অন্ধকারে ছেয়ে যায় ধরিত্রী। নিস্তব্ধতার জগদ্দল যেন চেপে বসে চতুর্দিকে। পাখীর কলকাকলি যে কখন থেমে গেছে তাও কারো মনে নেই। গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন প্রাণীকূল। মাঝে মাঝে দূরে কোথাও যেন ঘেউ ঘেউ করে ওঠে কুকুরের দল। এক সময় মাঝ রাতে বিকট প্রচন্ড গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাহাতদের। মনে হয় যুদ্ধ হচ্ছে বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালী সৈনিকদের মধ্যে। ভয়ে আঁখিকে বুকে টেনে নেয় সামিনা। যেকোন মুহূর্তে ঘরের বেড়া ফুটা করে গুলি এসে লাগতে পারে গায়ে। থর থর করে কাঁপতে থাকে সামিনা।

ঃ এখন কি হবে?

ঃ চুপ! শুয়ে থাক।

অনেকক্ষণ ধরে চলে গোলাগুলি। এক সময় থেমে যায় গুলির আওয়াজ। মনে হয় ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছে রণক্লান্ত সৈনিকরা। তাই বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়েছে সবাই। রাহাত সামিনারা নিজেরাই জানে না যে, কোন্ সময় তারা নিদ্রার অতলে তলিয়ে গেছে। পাখির কিচিমিচি ও কাকের কা কা শব্দে চোখ মেলে তারা দেখতে পায় সকাল হয়ে গেছে। ভোরের আকাশ নির্মল নির্মেঘ। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে খানিক পায়চারী করে সামিনা। রাহাত জাগাবস্থায় শুয়ে থাকে বিছানায়। আঁখি তখনও ঘুমাচ্ছে। মাসুম শিশু। কি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে! রাত্রে তেমন বিরক্ত করেনি আঁখি। একবার মাত্র কঁকিয়ে কেঁদে ওঠেছিল। সামিনা ওঠে দুধ তৈরি করে খাইয়েছিল বলে এখনো শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। রাহাত একবার সামিনাকে ডাকে।

ঃ সামিনা!

সামিনা তখনো সকালের উঠানে মুক্ত বাতাসে হাঁটছিল বলে রাহাতের ডাক শুনতে পায়নি। এসময় ফজরের নামাজ পড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কিছুদূর হেঁটে বাড়ী ফিরে আসার সময় সামিনাকে হাঁটতে দেখে কাছে গিয়ে বলেন হাজী নওয়াব মিয়া-

ঃ কিছু শুনেছ, বৌমা।

ঃ কি, চাচা? কই, কিছু শুনিনি তো।

ঃ রাত্রে পাকিস্তানী আর্মি রেডিও ষ্টেশন দখল করে নিয়ে কালুরঘাট ব্রিজ পার হয়ে গেছে।

ঃ তাই নাকি!

ঃ অনেক ঘরবাড়ী কামানের গোলায় ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। মানুষ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। আল্লাহ্ জানে কি হয়। বাঙ্গালী পুলিশ, আনসার, ইপিআর কেউ কোথাও নেই। সব পালিয়েছে। কেন যে তারা বিদ্রোহ করতে গেল!

ঃ বিদ্রোহ না করে তো উপায়ও ছিল না, চাচা। পাকিস্তানী আর্মি যখন ঢাকার পিলখানা ও রাজার বাগে অতর্কিত হামলা করে ইপি আর ও পুলিশদের শেষ করে দিল তখন কি আর ওরা চুপ করে থাকতে পারে!

ঃ না, মা। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েই যে কোন কাজে হাত দেয়া উচিত। জানি না, এখন কি হবে।

বলতে বলতে নিজেদের ঘরে চলে যান হাজী নওয়াব মিয়া। নিশ্চল খানিক দাঁড়িয়ে থাকে সামিনা। পূর্বাকাশ লাল হয়ে উদিত হচ্ছে সকালের সূর্য। সামিনাও ফিরে যায় ঘরে। পেশাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছে আঁখি। সবকিছু পাল্টে দেয় সামিনা। আড়মোড়া ভেঙ্গে রাহাতও ওঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে নাস্তা করতে বসলে সামিনা বলে-

ঃ চাচা বললেন, পাকিস্তানী আর্মি নাকি কালুরঘাট রেডিও ষ্টেশন দখল করে নিয়ে ব্রিজ পার হয়ে গেছে।

ঃ তিনি কার কাছে শুনলেন?

ঃফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে মসজিদে লোকের মুখে শুনে এসেছেন।

ঃ হবেও বা।

ঃ এখন আমাদের কি হবে?

ঃ আমাদের কি হবে মানে?

ঃ না, ভাবছি, আমাদের কোন বিপদ হবে নাতো!

ঃ আমাদের কিসের বিপদ! আমরা তো কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

ঃ তবুও বলা যায় না, রাহাত ভাই। পাকিস্তানী আর্মি নাকি পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেছে। যাকে কাছে পাচ্ছে তাকে গুলি করে মারছে। আর নানাভাবে অত্যাচারও করছে।

আজিজের কথায় কেমন যেন এক অশরীরী ভীতি রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায় রাহাতের। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে নিজের অগোচরে ভেতরে ভেতরে। আজিজ আবার বলে-

ঃ আমি ভাবছি, দেশের বাড়ীতে যাব।

ঃ আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, মিয়াভাই!এই পরিস্থিতিতে আপনি দেশের বাড়ীতে যাবেন কি করে?

আজিজের সিদ্ধান্তকে রাহাত কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। সামিনাও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে।

ঃ অনেকেই যাচ্ছে। আমাদের বাসার কাছের মুদির দোকানদার যাকে আমরা মামা বলে ডাকি তিনিও যাচ্ছেন। তাঁর বাড়ীও তো আমাদের ওদিকে।

ঃ পথঘাটের নিরাপত্তা কোথায়? গাড়ীঘোড়া তো কিছুই চলছে না।

ঃ হেঁটেই যাচ্ছে সবাই। যতদিন লাগে লাগুক। মামাও যাবে। বাড়ী ঘরের খবরাখবর তো কিছুই পাচ্ছিনা। জানি না কি হচ্ছে সেখানে।

দেশের বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজনের দুশ্চিন্তায় মন ব্যাকুল হওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে বর্তমান পরিস্থিতিতে হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে সুদূর উত্তর বাংলায় যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! কোনমতেই সায় দিতে পারে না সামিনা।

ঃ কেন তোরা বুঝতে পারছিস না, মিনা। ওখানে আব্বা আছে, আম্মা আছে। তোর ভাবীরা আছে। ওদের খবরাখবর তো কিছুই পাচ্ছিনা।

ঃ কিন্তু তাই বলে ---।

ঃ মরণ হলেতো এখানেও হতে পারে।

শত বাধা আপত্তি সত্ত্বেও আজিজ রওনা হয়ে যায় বাড়ীর উদ্দেশে, সঙ্গে সেই কথিত মামা ও আরও দুয়েকজনকে নিয়ে। এদিকে পাকিস্তানী আর্মি দ্রুত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের দখল মজবুত করে ভারতীয় সীমানা পর্যন্ত পৌছে গেছে। ভয়ে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে এক দিক থেকে অন্যদিকে। অনেকে আবার সীমান্তের ওপারেও। অধিকাংশই বড়লোক। গরীব দুঃখী ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা যার যার বাড়ী ঘরে অবস্থান করে সময়ের পরিণতির অপেক্ষায় থাকে। শুরু হয়ে যায় দিকে দিকে শান্তি কমিটি গঠনের তোড়জোর। চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার জনৈক মন্ত্রীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে গঠিত হয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে সর্বত্র গঠিত হয় শান্তি কমিটির অগুণতি শাখা প্রশাখা। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ নির্ভয়ে শান্তিতে বাঁচতে চায়। পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে তারা দলে দলে মিছিল করে দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা পাকিস্তান সরকারের পক্ষেই আছে। তারা পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক নাগরিক।

ঃ কয়বার স্বাধীন হব! সাতচল্লিশ সালে একবার স্বাধীন হয়েছি। এখন আবার কিসের স্বাধীনতা! বঙ্গবন্ধুও তো সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন।

দুঃখ করে বলেন হাজী নওয়াব মিয়া। বশরের বাপের বক্তব্যও প্রায় একই ধরণের। বশরের আব্বা ছালামত সাহেবের সঙ্গে আরেক বার দেখা হয়েছিল রাহাতের কয়েকদিন আগে।

ঃ বাবা, তোমরা তো মায়ের কোলেই আছ। এই পাকিস্তান বানাতে গিয়ে আমাদের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ইজ্জত দিতে হয়েছে বহু মা বোনের। রক্ত ঝরাতে হয়েছে লাখো লাখো মানুষের। এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন কেউ কিছু বলে তখন ভেতরটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। সহ্য হয় না।

ঃ না, চাচা। শেখ সাহেব তো আগে পাকিস্তান ভাঙ্গার কথা কিছুই বলেন নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে সরকার গঠন করতে দেয়া হল না। এটা কি বাঙ্গালীদের দাবিয়ে রাখার চক্রান্ত নয়?

ঃ আমরাও তো সেকথা বলি, বাবা। এ চক্রান্ত কেন? কেন আজ ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনি রক্তারক্তি?

ভয়ে প্রাণ রক্ষার্থে লোকজন চারদিকে পালিয়ে গেলেও হাজী নওয়াব মিয়া ও ছালামত সাহেবরা কোথাও পালিয়ে যেতে প্রস্তুত নন। এমন কি রাহাতদের মত মানুষেরা তো নয়ই। আর রাহাতরাও-বা যাবে কোথায়? তাদের তো গ্রামেগঞ্জে এমন কেউ নেই যে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে! তাই তারা থেকে যায় পৈতৃক বাড়ীভিটায়। প্রস্তুত হয় বরণ করে নিতে অদৃষ্টের চরম পরিণতিকে। যদিও হাজী নওয়াব মিয়ারা যে কোন সময় চলে যেতে পারেন গ্রামে তাঁর বোনের বাড়ীতে। সিফাতের শাশুড়ী তাঁর বোন তাঁকে বহু বার বলেছে। এমন কি সিফাতও।

ঃ ভাইজান, আপনারা আমাদের ওখানেই চলুন। ভাবী আর শাকিলকে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবেন কেন! যে কোন সময় যে কোন বিপদ আসতে পারে।

ঃ আম্মা, তুমি আব্বাকে রাজী করাও না।

সিফাতের শাশুড়ী ও সিফাতের শত অনুরোধ সত্ত্বেও হাজী নওয়াব মিয়ার এক জওয়াব।

ঃ না। মরতে হয় এখানে। বাঁচতে হয় এখানে। যে পাকিস্তানের জন্য একদিন আন্দোলন করেছিলাম সে পাকিস্তানে যেমনি করেই হোক শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হবে। সেজন্যেই তো শান্তি কমিটি গঠন করেছি।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসছে! পাকিস্তানী আর্মি চট্টগ্রাম শহরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে না করতেই একদিন সবাই দেখতে পেল চট্টগ্রাম শহরে হিন্দুদের প্রধান আস্তানা বলে খ্যাত প্রবর্তক সংঘে লুঠতরাজ। দেখল সবাই বিসফারিত নেত্রে। দেখল পাহাড়ের পশ্চিমে সূর্য তখন ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক বাকী। প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া জনশূন্য প্রবর্তক সংঘে একটি প্রাণীও নেই কোথাও। রাহাত জামা জাইঙ্গা পরিয়ে আঁখিকে কোলে করে উঠানে পায়চারী করতে করতে তাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তায় গিয়ে দেখে মিয়ার বাপ, মিয়ার ভাই জাহেদ ও শাকুর একটি ছোট কাচের আলমারী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বাড়ীর দিকে। রাহাতকে দেখে হেসে বলে মিয়ার বাপ-

ঃ নেবেন, ভাইজান?

ঃ এটা আবার কোথেকে নিয়ে আসছ?

ঃ প্রবর্তক সংঘে থেকে।

ঃ প্রবর্তক সংঘ! ওখানেও কি আবার লুঠতরাজ শুরু হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ, অনেক মানুষ অনেক কিছু নিয়ে গেছে। আমরা বেশী কিছু নিতে পারিনি। শুধু এই আলমারীটা ধরেছি। মিয়া একটা টেবিল আর কিছু হাঁড়ি পাতিল নিয়ে এসেছে। দামী কিছু ছিলও না। কয়েকটি টেবিল চেয়ার আলনা হাঁড়ি পাতিল বাসন কোসন এসব ছাড়া তেমন কোন মূল্যবান জিনিস ছিলনা। নেবেন, ভাইজান, নিন না। দু একটা ভাঙ্গা কাচ বদলে ভাল কাচ লাগিয়ে পালিশ করে দিলে সুন্দর আলমারী হয়ে যাবে। দাম আপনি যা ইচ্ছে দেবেন।

ঃ নারে ভাই, আমার সে টাকা নেই।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় আলমারীটা মিয়ার বাপরা। উদাস নয়নে বেহুঁশের মত হা করে চেয়ে থাকে রাহাত তাদের দিকে। এরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ী লুঠ করছে। দুতিন দিন আগেও রাহাত দেখেছে লাল দীঘির পাড়স্থ ঘড়ির দোকান ও লেদার সুটকেসের দোকান কিভাবে লুঠ হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সকাল দশ এগারটার দিকে লাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে পৌছুতে না পৌছুতেই রাহাতের পায়ের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারই চোখের সামনে দশ বারো জন লোক চৌধুরী লেদার হাউস ও ভুঁইয়া ওয়াচ কোং এর দোকানের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে যে যা পেয়েছে হাতড়ে নিয়ে চলে গেছে। কাউকে বাধা দেয়ার কেউ সেখানে ছিলনা। লুঠ করার যারা তারা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছিল। বাকীরা দেখছিল নীরব দর্শকের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোথাও কেউ ছিলনা তাদের বাধা দেয়ার। আজো হয়ত কাউকে কেউ বাধা দিচ্ছে না প্রবর্তক সংঘেও। এই কি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসা! ভাবে রাহাত। কদিন এভাবে চলতে পারে একটি দেশ! পরের দিন সকাল বেলা সাত আটজন পাকিস্তানী সৈন্য একজন বিহারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী চেক করতে আসে। কার বাড়ীতে কি অস্ত্র আছে, কোন বাঙ্গালী সৈনিক বা পুলিশ কোথায় লুকিয়ে আছে এসব খুঁজতে থাকে প্রত্যেক বাড়ীতে। রাহাত তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। আলো ঝলোমলো দিন। অস্ত্রধারী মিলিটারী দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম সবার। খাকি পোশাক পরিহিত সশস্ত্র সৈনিক কয়জনকে দেখে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ আজরাইল। জান কবজ করতে এসেছে তারা প্রত্যেক বাড়ীতে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল নরনারী বৃদ্ধ সবাই। সম্যক মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়িয়ে জপছিল সবাই কলেমা। আর রক্ষা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু। আঁখিকে কোলে নিয়ে ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে বসে কাঁপছিল সামিনা। ক্যাপটেইন ফুলধারী গোঁফওয়ালা পাকিস্তানী সৈনিকটা কাছে এসে তার সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সঙ্গে রাইফেলটায় হাত দিয়ে বলল-

ঃ ঘাবড়াও নেহী, বহিন। হাম ভি ইনসান, জানোয়ার নেহী। আগর কাঁহি কোই হাতিয়ার ছোপা রাখনেছে নিকাল দো।

ঃ আমাদের ঘরে কোন অস্ত্র নেই।

ঃ কেয়া বোলতা?

ঃ বোল রাহি হে ইস লোগকা পাস কোই হাতিয়ার নেহী হে।

বিহারীটা বুঝিয়ে দিল যে এদের কাছে কোন অস্ত্র নেই। শুনে খানিক যেন কি ভাবল গোঁফওয়ালা ক্যাপটেইন সৈনিকটা, তারপর সবাইকে হুকুম দিল।

ঃ চলো।

সৈনিকগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়েছে সবার। সামিনা বলল-

ঃ আমি নিজের জন্য যত না ভয় পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়ে ছিলাম আমার আঁখির জন্য। যদি আমার আঁখিকে গুলি করে মেরে ফেলত! বিশ্বাস কি, মানুষ মারা তো ওদের জন্য মাছি মারা!

ঃ আমি ভয় পেয়েছিলাম তোমার জন্য।

ঃ আমার জন্য!

ঃ হ্যাঁ, বলা তো যায় না। জানোয়ারগুলো যদি তোমাকে বেইজ্জত করত।

ঃ আল্লাহ্র হাজার শোকর।

সামিনা দুহাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে যেন মুনাজাত করে। ভয়ংকর ফাঁড়া কেটেছে তাদের। শুনেছে ঢাকার ওদিকে নাকি পাকিস্তানী সৈন্যরা বহু লোককে মেরেছে। বহু নারী ধর্ষণ করেছে।

ঃ অবশ্যই সব মানুষ এক রকম হয় না। ভালমন্দ সব জায়গাতেই আছে।

আনমনেই যেন বিড় বিড় করে উচ্চারণ করে রাহাত। সেও তো একবার পড়েছিল খানসেনাদের খপ্পরে। তখনকার পাকিস্তানী হাবিলদারটার ঔদার্যের জন্যই সেদিন রাহাত ও অন্যান্যরা বেঁচে গিয়েছিল। সেদিন যদি ওদেরকে ছেড়ে না দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলত কেউ কি তাদের কিছু করতে পারত? আজও যেরকম ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। হাজী নওয়াব মিয়া উঠানে এসে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন সামিনাকে।

ঃ বৌমা, ও বৌমা। তোমরা কোথায়?

ঃ এই যে চাচা, আমরা এখানে।

আঁখিকে কোলে করে তাড়াতাড়ি ছুটে ঘরের বের হয় সামিনা। সঙ্গে রাহাত।

ঃ তোমাদের এখানে মিলিটারীরা এসেছিল?

ঃ জ্বি, চাচা।

ঃ কি করেছে? আমাদের ওখানেও গিয়েছিল। প্রত্যেক রুমে গিয়ে তন্ন তন্ন করে অস্ত্র খুঁজেছে। কোন পুলিশ রাইফেলের লোককে লুকিয়ে রেখেছি কিনা তাও দেখেছে। ওদেরকে এত করে বললাম, আমি পুরনো মুসলিম লীগার। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছি। আমি কি কোন বিদ্রোহীকে জায়গা দিতে পারি! আমার কথা বিশ্বাসই করল না। আরও বলল কি না, খামোশ রহো বুড্ডা। তোম্ বাংগালী লোগ বেঈমান হেঁ। আচ্ছা, বাবা, তোমরাই বলতো আমরা কি বেঈমানী করলাম!

সামিনা ও রাহাত মুচকি মুচকি হাসে।

সাত

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সেনা বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পর দিকে দিকে শুরু হয় খানা তল্লাসী। শহর ছেড়ে লোকজন গ্রামের পথে পাড়ি জমায়। অনেক লোক বাড়ীঘর ছেড়ে সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়। এমন কি রাহাতদের পাড়ার মিয়ার বাপ ভাইরাও পালিয়ে যায় ভারতে। গুজব উঠেছে যারা লুঠতরাজ করেছে তাদেরকে আর্মিরা গুলি করে করে মারবে। দিকে দিকে গঠিত হচ্ছে রাজাকারের দল। পুলিশের স্থলে অবাঙ্গালীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড্ ফোর্স। সংক্ষেপে ই. পি. সি. এ এফ। আর ওদিকে ঘোষণা করা হয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে, গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ভয় পাবেন না। আমাদের তরুণেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে দলে দলে। আমাদের ছেলেরা আপনাদের আশে পাশেই আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। হুঁশিয়ার করে দিন রাজাকারদের। তারা যেন হানাদার বাহিনীর সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা না করে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই উৎকর্ণ হয়ে যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শোনার জন্য। কোথেকে যে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর প্রচারিত হয় তা কেউ বলতে পারে না। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে গোয়েন্দা বিভাগের সবাই খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব। ভূতুড়ে বেতার বলে মনে হয় সবার কাছে। সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হয় বি বি. সির খবর। মার্কটালীর ভাষ্য। বি. বি. সির ভাষ্যকার মার্কটালী কোথেকে যে এত সব খবর সংগ্রহ করে তা একমাত্র আল্লাহই জানে। পাকিস্তানী খবরের মধ্যে শোনা যায় শুধু, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে দেশে। প্রত্যেককে যার যার কাজ কর্মে যোগ দেয়ার জন্য তাগিদ দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। আশ্বস্ত হয় না দেশবাসী। তারা শুনে বিদেশী খবর। নিজেদের দেশের খবর জানার জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হয় বিদেশী আকাশ বাণী, ভোয়া ইত্যাদির ওপর।

কোম্পানীর তরফ থেকে রাহাতের ওপর নির্দেশ আসে কাজে যোগদানের জন্যে। রাহাত যোগাযোগ করে কোম্পানীর অফিসের সঙ্গে। মিলের তিন শিফ্টের স্থলে চালু হয় কেবল এক শিফ্ট। জেনারেল শিফ্ট। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা। তাও পুরা ডিপার্টমেন্ট চালু করতে পারে না রাহাত। অনেকগুলি তাঁত খালি পড়ে থাকে। শ্রমিক নেই। এতগুলি তাঁত বিভাগের শ্রমিক। কে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। হয়ত অনেকে চলে গেছে বাড়ী ঘরে। কেউ কেউ অন্যত্র। কেউ কেউ হয়ত প্রাণও হারিয়েছে দাঙ্গা হাঙ্গামায়। যে কয়জন শ্রমিক কাজে কর্মে যোগদান করেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিহারী। বাঙ্গালী শ্রমিকের তিন ভাগের দুভাগই অনুপস্থিত। বিহারী শ্রমিকেরা নিকটবর্তী হামজারবাগ মোহাজির কলোনীরই বাসিন্দা। পঁচিশে মার্চের পর মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে সব পালিয়ে গিয়েছিল ঘরবাড়ী ছেড়ে যে যেদিকে পেরেছে সে সেদিকে। অনেককে প্রাণ হারাতে হয়েছে বাঙ্গালী শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতে। এখন আবার অনেকে ফিরে এসেছে, যারা বেঁচে আছে তারা বিভিন্ন স্থান থেকে। এতৎসত্ত্বেও পুরা মিল চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি মিল ম্যানেজমেন্টের পক্ষে। বেচিং, বিমিং, উইভিং, ফিনিশিং, মেইনটেনান্স সব ডিপার্টমেন্টেই লোকঘাটতি। হিন্দু

কর্মচারীদের একজনও যোগদান করেনি কাজে। বড়ুয়াদের মধ্যে যোগদান করেছে কিছু কিছু। এম ডি থেকে শুরু করে কোম্পানীর বহু অবাঙ্গালী বড় বড় অফিসারকে মেরে ফেলা হয়েছে। এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, মেডিকেল অফিসার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, ফিনিশিং ইনচার্জ প্রমুখের স্থলে নিয়োগদান করা হয়েছে নতুন নতুন লোকদের। তাদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও চালু হয় না মিল পুরাদমে। শুধু রাহাতদের মিল নয়। সব মিলকারখানায় একই অবস্থা। কিছুদিন যেতে না যেতেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা।

ঃ এভাবে একটি দেশ চলতে পারে!

ঃ আরে ঘাবড়ান কেন, রাহাত সাহেব। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখে নেবেন। আমি বললাম।

অবাঙ্গালী বিমিং ইনচার্জ সাহেব আশ্বস্ত করতে চান রাহাতকে।

ঃ চোরা গোপ্তা হামলায় পাকিস্তানী আর্মিকে কাবু করা সহজ নয়। কদিন না খেয়ে থাকবে। আস্তে আস্তে সব শ্রমিক চারদিক থেকে এসে জুটে যাবে।

শ্রমিক কিছু কিছু এসে কাজে যোগ দিয়েছে সত্যি। নতুন শ্রমিকও নেয়া হয়েছে বেশ কিছু। কিন্তু তবুও প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। হাজার মেশিনের মধ্যে মাত্র তিন চারশ চালু করতে পেরেছে রাহাতরা। অবশিষ্ট সব বন্ধ। উৎপাদন হয় না বললেও চলে।

অথচ এদিকে রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে সর্বক্ষণ, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। কলকারখানা পুরাদমে চলছে। রাস্তাঘাট মুখর সকল প্রকার যানবাহনে। অফিস আদালতে স্বাভাবিক কাজ কর্ম চলছে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। যেসব লোকজন বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকজন তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে এসেছে বা আসছে! কৃষকেরা নির্ভয়ে কাজ করছে তাদের মাঠে! ফলাচ্ছে আবার সোনালী ফসল জমিতে! বিহঙ্গকুল উড়ে বেড়াচ্ছে নির্মেঘ নির্মল আকাশের সীমাহীন নীলিমায়! মাঝি মাল্লার কণ্ঠে ভাটিয়ালী গানের সাথে সাথে নৌকা চলছে রূপালী নদীর স্রোতে! জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে নদী

সমুদ্রে! কুমারেরা তৈরি করছে তাদের মেটো হাতের স্পর্শে নিত্যনতুন বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের আধার! পল্লীবালারা অকুতোভয়ে ছুটাছুটি করতে পারছে [illegible] ঘরে মুরগী ও ভেড়া ছাগলের শাবক কোলে নিয়ে গাঁয়ের অলিতে গলিতে উচ্ছল হয়ে! ছেলে মেয়েরা মশগুল হতে পারছে হাডুডু আর দাড়িয়া বান্ধা খেলা নিয়ে মাঠে ময়দানে! কিষাণের মেয়েরা কি পারছে কলসী কাঁখে নদীতে পানি আনতে যেতে! পারছে কি তারা উঠানে তাদের সোনালী ধান নেড়ে চেড়ে শুকাতে! পারছে কি গাঁয়ের দস্যি দুষ্টু ছেলেমেয়েরা নদী নালা ডোবা পুকুরের ঘোলা পানিতে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে খেলা করতে! ঘোমটা টানা গ্রাম্য তরুণীর চোখে মুখে হরিণী শাবকের ভয়ভীতির ছায়া কেন। অজানা কিসের আতঙ্ক বিরাজমান সর্বত্র। শান্তি কমিটি থেকে সবাইকে দেয়া হচ্ছে আইডেনটিটি কার্ড। আইডেনটিটি কার্ড ব্যতীত রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা দুরূহ। আইডেনটিটি কার্ড প্রমাণ করবে কে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বা পাকিস্তানী। দুষ্কৃতিকারীরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তাই রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাটে বাজারে, যেখানে লোক সমাগম বেশী, যানবাহন চলাচল করে [illegible] সেখানেই চলে চেকিং। আর্মি, ইপিসিএ এফ, বিহারীরা মিলে চেক করছে সবখানে। যাকে সন্দেহ হয় তাকে ধরে নিয়ে যায়। নিয়ে কোথায় যায় কেউ বলতে পারেনা। রাহাতও পড়েছিল একবার ওদের খপ্পরে। ডিউটি থেকে বের হয়ে সে গিয়েছিল আমবাগানে তার এক পরিচিতের বাসায়। ওখান থেকে ফেরার পথে এক পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ফুঁকছিল এবং অপেক্ষা করছিল গাড়ীর জন্য। এমন সময় দুতিনজন রাইফেলধারী সিপাহী তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তাকে।

ঃ কেয়া নাম হে তোমহারা?

নাম বলার সাথে সাথে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সিপাহীগুলো। ওদের মধ্য থেকে একজন আবার চেয়ে বসে আইডেনটিটি কার্ড।

ঃ ডান্ডি কার্ড নিকালো।

রাহাত বের করে দেয় তার কোম্পানীর আইডেনটিটি কার্ডখানা। ওটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে। মনঃপূত না হওয়ায় আবার জিজ্ঞেস করে।

ঃ ইয়ে কেয়া হ্যায়। আসলী ডান্ডি কার্ড কাঁহা হ্যায়?

ঃ [illegible] আইডি কার্ড মানে?

ঃ পিস কমিটি কা কার্ড।

ঃ আমার কাছে আর কোন আইডেনটিটি কার্ড নেই।

ঃ তোম পাকড়ার হ্যায়। চলো।

হাত ধরে রাহাতকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করে।

ঃ কেয়া হ্যায় পকেট মে, নিকালো।

পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল পাঁচটা টাকা, কিছু খুচরা পয়সা ও কয়েকটি সিগারেট। এসব নিয়ে নিল সিপাহীগুলো। এমন সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিল একখানা জীপে করে কয়েকজন সেনা অফিসার। তাদের দেখে রাহাতকে ছেড়ে দেয় সিপাহীগুলো।

ঃ আভি চলা যাও। ফের দেখনেছে তোমকো পাগাড় লোঙ্গা।

রাহাত ওখান থেকে এসে হাজী নওয়াব মিয়াকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললে তিনি মাথা কুটতে থাকেন।

ঃ তোমাদের বহুবার বলেছি, বাবা, শান্তি কমিটি থেকে একটি আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে নিতে। তোমরা তো কোন কথাই শুনতে চাও না। কালকেই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আইডেনটিটি কার্ড বানিয়ে দেব। পাসপোর্ট সাইজের ফটো আছে তো?

ঃ আছে।

ঃ ঠিক আছে। কালকে তোমাকে শান্তি কমিটি অফিসে নিয়ে যাব। ---- ওদের দোষই কি দেই, বাবা! আমাদের ছেলেরা আজকাল যা শুরু করেছে! আর্মি দেখলেই সুযোগ বুঝে অমনি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। রেল লাইন উপড়ে ফেলে। ইলেকট্রিক খাম্বা নষ্ট করে ফেলে। মিলিটারী আসতে দেখলে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় লোকালয়ে। তখন মিলিটারীরা তাদের খুঁজতে গিয়ে না পেয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। ----- তোমরা যাই বল, বাবা, এজন্যে দায়ী আমাদের ছেলেরা। আমার নিজেরটাও গিয়ে জুটেছে তাদের সঙ্গে। এরা নাকি বাংলাদেশ স্বাধীন করবে। কোন

বাংলাদেশ তোমরা স্বাধীন করছ। যেটা ভারতের দখলে আছে সেটাকে তো মুক্ত করতে পারছ না। কই পশ্চিম বঙ্গের লোকেরাও তো তাদের রাজ্যটাকে মুক্ত করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাচ্ছে না। ---- এসব হিন্দুস্তানের চক্রান্ত। পাকিস্তান ভেঙ্গে টুকরা করে ফেলতে পারলে আমরা দুর্বল হয়ে যাব। তখন এক একটাকে গ্রাস করে নিয়ে বৃহৎ ভারত গঠন করা তাদের পক্ষে সহজ হবে।

হাজী নওয়াব মিঞার যত আক্রোশ সব মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র সন্তান শাকিলকেও ফুসলে ফাসলে তারা ভিড়িয়ে নিয়ে গেছে তাদের দলে। যদি শাকিলের কিছু হয়ে যায় তিনি কি করে সহ্য করবেন। ছেলেটা আবার তার মাকে বলে কি না দেশ স্বাধীন করেই বাড়িতে ফিরবে। তার আগে নয়।

আট

রাতের অন্ধকার হালকা পাতলা হয়ে গেছে চতুর্দিকের বিজলি বাতির বিচ্ছুরিত আলোর আভায়। রাত বেশী হয়নি। আটটা কিংবা সাড়ে আটটা। কিছুক্ষণ আগেই এশার আজান হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট এখনো মুখর যানবাহন ও লোক চলাচলে। খটাখট কড়া নাড়ার শব্দ আসে অনবরত বাইরে থেকে। বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে খাটে। পাশে একখানা চেয়ারে বসে ডাঃ আলী। টেবিলের ওপর ট্রানজিষ্টার। খবর শুনছে আলী। অবিরাম কড়া নাড়ার শব্দ হঠাৎ কানে যেতেই সচকিত হয়ে ওঠে। বিরক্তির ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমগ্র মুখমন্ডল। নিজকে একরূপ টেনে হিঁচড়ে যেন জোর করে নিয়ে যায় দরজার কাছে। দরজা খুলতেই আকাশ থেকে পড়ার উপক্রম আলীর। অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

ঃ অনিল বাবু, আপনি!

পায়জামা পাঞ্জাবী পরিহিত অনিল বাবুকে প্রথমে চিনতেই পারেনি আলী। কালো লম্বা দাড়িতে সারা মুখ ভর্তি। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পর চিনতে পেরেছে। তাও সঙ্গের মহিলাটিকে নয়। কালো বোরকায় আবৃত

আপাদমস্তক মহিলাটির। হতবাক হয়ে ডাঃ আলীকে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে অনিল বাবু-

ঃ ভেতরে আসতে পারব?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন, আসুন।

সম্বিৎ ফিরে পায় যেন ডাঃ আলী। সঙ্গের মহিলাটির দিকে সোৎসুক নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

ঃ কিন্তু এঁকে তো----!

ঃ নেকাব তুলে বোরকা খুলে চেহারা সুরত একবার দেখাও তোমার বান্ধবী পতিকে। উনার অনুসন্ধিৎসা মেটাও।

বোরকা খুলে মুচকি হাসতেই মহিলাটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে আলী।

ঃ কিন্তু এসবের অর্থ কি, শিপ্রা? আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ঃ চিনলেন না!

ঃ না।

ঃ ভাল করে দেখুন। আমি এখন হিন্দু নই। মুসলিম। দেখুন তো আমার সিঁথিতে সিন্দুর নেই। কপালে টিপ নেই। হাতে শাখা নেই। কে বলবে আমি শিপ্রা চক্রবর্তী। আর উনি অনিল চক্রবর্তী।

ঃ জেরীন। ও জেরীন।

ঃ কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছ কেন?

ঃ দেখে যাও না, কারা এসেছে।

হাতমুখ ধুয়ে একরূপ বিরক্ত হয়েই যেন রান্নাঘর থেকে এসে শিপ্রা ও অনিল বাবুকে দেখে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় জেরীন।

ঃ আরে শিপ্রা, কি ব্যাপার! তোরা কোত্থেকে আসলি এত রাত্রে!

ঃ তোদের কাছে আশ্রয় নিতে আসলাম। আশ্রয় দিবি তো?

ঃ দেব না মানে! একশ বার দেব। আগে কাপড় চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নে। তারপর খাওয়া দাওয়া করে তোদের কথা শুনব।

ঃ তুই শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নস, জেরীন। একই সঙ্গে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত লেখা পড়া করেছি। তার পরেও আমাদের বন্ধুত্বে কোন দিন ফাটল ধরেনি। এমন কি বিয়ের পরেও আমরা আগের মত থেকে গেছি। কোন দিন হৃদ্যতায় ঘাটতি হয়নি।

একই সঙ্গে খেতে বসে কথা কটি উচ্চারণ করে শিপ্রা। স্বর ভারাক্রান্ত। চক্ষুদ্বয় ঝাপসা হয়ে যায় অশ্রুর কুয়াশায়।

ঃ যাক, ওসব কথা এখন। আগে খেয়ে নে তো।

ঃ হিন্দু হয়ে আমরা বড় অপরাধ করে ফেলেছি, বোন।

ঃ তোরা বাজে আলাপ বন্ধ করবি কিনা!

ঃ জানি আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা এদেশটাকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে পারে না। তারা এখানে থাকলেও তাদের সবকিছুই ভারতেই। ভারতকেই তারা মনে করে তাদের দেশ। এদেশটাকে ভারতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই তারা খুশী। তাদের মত কতিপয় বেঈমানের জন্য আজ সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিপদ নেমে এসেছে।

জেরীন বারবার বাধা দেয় শিপ্রাকে। আলীও বারণ করে তীব্রভাবে।

ঃ আগে খেয়ে নেন তো, দিদি। তারপর আপনাদের কথা শুনব।

ঃ জানেন, আলী ভাই, এ কদিন আমরা কোথায় ছিলাম।

ঃ কোথায়?

ঃ গরীব এক পিয়নের বস্তি বাড়ীতে। সমস্ত চট্টগ্রাম যেদিন পাকিস্তানী আর্মি দখল করে নিল সেদিনও ভাবতে পারি নি যে আমাদের ওপর কোন বিপদ আসতে পারে। অনেক হিন্দু বাড়ীঘর ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেছে। আমরা যাইনি। ভেবেছি আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। আমরা তো রাজনীতিও করিনা। ইনসিউরেন্স কোম্পানীতে চাকরী করি আমি আর শিপ্রা করে কলেজে

[illegible]। আমরা কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। এদেশ তো আমাদের মাতৃভূমি। এদেশ ছেড়ে কেন পালাব। তাই পালাইনি।

অনিল বাবু এক এক করে বলে যায় সব কথা। চট্টগ্রামের পতনের পর অনিল বাবুর অফিসের বৃদ্ধ পিয়ন জালাল মিয়া তাদের বাসায় গিয়ে একদিন হাজির। তখন রাত প্রায় দশটা। সঙ্গে তার এক পুরনো বোরকা।

ঃ স্যার, আপনাদের এখানে থাকনটা নিরাপদ হইব না।

ঃ কেন, জালাল মিয়া, আমরা কোথায় যাব তাহলে?

ঃ আপনারা আমার লগে চলেন। আমাগো বাসায় থাকবেন।

শিপ্রা ও অনিল দুজনই জালালের দিকে হা করে চেয়ে থেকেছিল অনেকক্ষণ। সত্যিই তো, ওরা যে হিন্দু! যে কোন সময় আর্মিরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ঃ তাই চল, জালাল মিয়া।

ঃ তাইলে চলেন। কিন্তু মাসিমার সিন্দুর মুছে ফেলতে হইব। শাখাও খুলে ফেলন লাগব। আর এই বোরকাটা পরন লাগব।

ঃ জালাল মিয়া ঠিকই বলছে। তাই কর।

শিপ্রাকে বোরকা পরিয়ে আর অনিল বাবুকে লুঙ্গি পরিয়ে জালাল মিয়া তার বস্তি বাড়ীতে সেদিন নিয়ে যায়। ঘরে বৃদ্ধ জালাল মিয়া ও তার স্ত্রী খায়রুন্নেসা ব্যতীত আর কেউ তেমন ছিল না। বড় দুটি ছেলেই বিয়ে করে বৌ বাচ্চা নিয়ে পৃথকভাবে বাসা নিয়ে থাকে। শুধু একটি মেয়েই এখনো অবিবাহিত আছে। বয়স দশ বারো বছরের মত। বাপমার সঙ্গে থাকে। সেও বড় ভাইয়ের বাসায় ছিল, সে সময় বড় ভাবী পোয়াতী ছিল বলে। জালাল মিয়া রাত্রে শিপ্রাদের নিয়ে ঘরে যেতেই খায়রুন্নেসা হন্তদন্ত হয়ে বরণ করে নিয়েছিল তাদের। নিরীহ ও গোবেচারা ধরণের মানুষ জালাল মিয়া ও খায়রুন্নেসা। শিপ্রা ও অনিল বাবুকে দেখে পাড়া প্রতিবেশীদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। জালাল মিয়া তাদের জানায়-

ঃ আমাগো অফিসের বড় সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। আমাগো এখানে কিছু দিন থাকবেন বইলা আইছেন। বাসায় অসুবিধা তাই।

মাস দুয়েক কোন মতে জালাল মিয়ারওখানে ছিল অনিল বাবু ও শিপ্রা। কিন্তু এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী সৈন্যরা বস্তি এলাকায় বেশ কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের খৌজ করতে আসে। একবার দুতিনজন সৈন্যের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল অনিল বাবু। কি একটা কাজে বস্তির বাইরে গেলে তাদের মধ্যে এক গোঁফওয়ালা সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে গেলে সৈন্যটা ধীরে ধীরে তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে।

ঃ এই সাহাব, সোনো। তোম কাঁহা রেহনেওয়ালা হো?

সৈনিকটার প্রশ্ন শুনে ভয়ে অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে ওঠেছিল অনিল বাবুর। কোনমতে জবাব দিয়েছিল-

ঃ এই তো, ওদিকেই আমাদের বাসা।

ঃ তোমকো হাম চুপ চুপ কর পুচতা হোঁ। সাচ সাচ বোল না। আপনে ঝুট বোলনে কা কোশেশ কিয়ে তো হাম তোমকো হামারা ক্যাপটেইন সাহাব কা পাস লে যাওঙ্গা।

ঃ জিজ্ঞেস করুন। আমি যা জানি তাই আপনাকে বলব।

ঃ ইধার কাঁহি কোই মুক্তি রেহতা?

ঃ মুক্তিযোদ্ধা!

ঃ হাঁ, হাঁ। মুক্তিযোদ্ধা। কাঁহা রেহতা?

ঃ নাম শুনেছি। চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

ঃ কেঁউ ঝুট বোলতা?

ঃ সত্যি বলছি, খান সাহেব। মুক্তিযোদ্ধা কি রকম তাও জানিনা।

ঃ তোম হামারা সাথ্ মজাক করতা।

ঃ তৌবা, তৌবা। আপনারা আমাদের সরকারী ফৌজ। আপনাদের সঙ্গে কি আমরা মজাক করতে পারি!

[illegible], ঠিক হ্যায়। আগর কভি খবর মিলে তো হামকো বোল না। হাম ফের আয়েঙ্গে।

পাকিস্তানি সৈন্যগুলো আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। শুনে জালাল মিয়া ঘাবড়ে যায়। তার সাহেবদের নিরাপত্তা সে কতটুকু দিতে পারবে! বস্তিবাসীদের মধ্যেও তো বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে। কে কখন আর্মিদের লাগিয়ে দেয় যে জালাল মিয়ার ওখানে এক হিন্দু সাহেব তার স্ত্রীকে নিয়ে লুকিয়ে আছে। একদিন জালাল মিয়া অনিল বাবু ও শিপ্রার সামনে কাঁচু মাঁচু হয়ে যায়।

ঃ স্যার, আমি এখন কি করব? আমার তো ভীষণ ভয় লাগতাছে!

ঃ না, জালাল মিয়া, তুমি চিন্তা কর না। তোমরা আমাদের জন্য যা করেছ [illegible] যাও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা করবে না।

অনিল বাবু ও শিপ্রার মনের আকাশের ঈশান কোণে জমে ওঠে দুর্যোগের ঘনঘটা। কোথায় যাবে তারা এখন! কি করে তারা বাঁচতে পারে! ভারতেই কি শেষ পর্যন্ত তাদের চলে যেতে হবে! নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে কি তাদেরকে শেষ পর্যন্ত গলগ্রহ হতে হবে ভারতের! কিন্তু তাও কি সম্ভব। চতুর্দিকে গিজ গিজ করছে পাকিস্তানী সৈন্য, ই পি সি এ এফ ও বিহারী লোকেরা। ভারতে যাওয়ার পথে যদি কোথাও তারা ধরা পড়ে যায় যে তারা হিন্দু, তাহলে কি রক্ষা আছে! মৃত্যুর করাল ছায়া চতুর্দিক থেকে যেন গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে অনিল আর শিপ্রাকে। ভেবে পায় না তারা কি করবে।

ঃ চলো না জেরীনের ওখানে যাই। দেখি ওরা কি বলে।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় শিপ্রার জেরীনের কথা। অনিল বাবুরও মনঃপূত হয় শিপ্রার প্রস্তাব। জেরীন তো শিপ্রার বাল্য বন্ধু। তার স্বামী ডাঃ আলীও শিপ্রাদের ভাল জানে। বুদ্ধি পরামর্শ তো পাওয়া যেতে পারে।

ঃ অনেক ভেবে চিন্তে তোদের এখানে আসলাম। এখন তোরাই বল আমরা কোথায় যাই। কি করতে পারি।

ঃ কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। কিছুও করতে হবে না। দেশের পরিস্থিতি যতদিন স্বাভাবিক না হবে ততদিন তোরা আমাদের এখানেই থাকবি।

জেরীনের কণ্ঠে আশ্বাসপূর্ণ দৃঢ়তা। ডাঃ আলীও সমর্থন করে জেরীনকে।

ঃ কিন্তু তোদের ওপর বোঝা হয়ে---।

ঃ বাজে কথা বলিস না তো, শিপ্রা। ভুলে গেছিস সে প্রবাদ 'বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা।'

ঃ জেরীন, বোন আমার!

জেরীনের গলা জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে শিপ্রা। আলী ও অনিলের চোখও সিক্ত হয়ে যায় অশ্রুতে।

ঃ কি পাগলামী করছিস, শিপ্রা।

দুধে আলতা গায়ের রং শিপ্রার। লাল হয়ে যায় সমগ্র মুখমণ্ডল। চক্ষুদ্বয় হয়ে যায় রক্তিম।

ঃ আপনাদের এ উপকারের কথা আমরা জীবনেও ভুলতে পারব না, আলী ভাই।

ঃ কি যে বলেন অনিল বাবু। মানুষই তো মানুষের বিপদে কাজে আসে।

অনিলের হাত ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যায় ডাঃ আলী। শিপ্রাকে জড়িয়ে খাটের এক পাশে বসায় জেরীন। শিপ্রা বলে।

ঃ মাঝে মাঝে কি ভাবি, জানিস, জেরীন!

ঃ কি?

ঃ মুসলমান হয়ে গেলে বোধ হয় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। প্রাণ হারাবার ভয় থাকত না আর।

ঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে মুসলমান না হয়ে প্রাণের ভয়ে কেউ মুসলমান হতে চাইলে তাকে মুসলমান করা আমাদের ধর্ম সমর্থন করে না। বরং অন্য ধর্মাবলম্বীর ওপর জোর জবরদস্তি খাটাবার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে।

সে সময় বাচ্চা কেঁদে ওঠায় জেরীন বাচ্চার কাছে ছুটে যায়। শিপ্রা চেয়ে থাকে জেরীনের দিকে। আজ দুবছর হচ্ছে অনিল-শিপ্রার বিয়ে হয়েছে। এখনো বাচ্চা

কাচ্চা হয়নি। যদি বাচ্চা কাচ্চা হত তাহলে কি অবস্থা তাদের হত। আর ভাবতে পারে না শিপ্রা।

নয়

সূর্য তখনো উদিত হয়নি। প্রভাতী পাখীর কিচির মিচির ধ্বনির সাথে সাথে কাককুলের কা কা রবে বিরক্তি ধরে যায় সবার। সে সময় শোনা যায় হাজী নওয়াব মিয়ার বাড়ী থেকে কান্নার রোল। হাজীপত্নী মাসুদা খাতুনের গগনভেদী বিলাপে চমকে বিছানায় ওঠে বসে রাহাত ও সামিনা। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পরস্পর পরস্পরের। আঁখি ঘুমাচ্ছে বিছানায় পরম নিশ্চিন্তে। শেষ রাতে ওঠে একবার কান্নাকাটি করেছিল খিদেয়। দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িযে দিয়েছে সামিনা। এখনো ঘুমাচ্ছে। বেশ বড় হয়েছে এখন আঁখি, নাদুস নুদুস নিটোল। যেমনি গায়ের রং তেমনি গোলগাল নাক নকশা। যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া পুতুলের প্রতিকৃতি। মায়ার প্রলেপ সর্বাঙ্গে। মাঝে মধ্যে খিল খিল করে হেসে ওঠে আজকাল আঁখি। যে দেখে সে-ই কোলে তুলে নিতে চায় আঁখিকে। আঁখির খুব পছন্দ হাজী নওয়াব মিয়াকে। কোলে ওঠলে হয়েছে। তাঁর সাদা লম্বা দাড়ি তার খেলার সামগ্রী। নরম কচি হাত দিয়ে মুঠি মুঠি ধরে গান গাওয়া তার হবি!

ঃ বৌমা, তোমার মেয়ে আমার দাড়ি পছন্দ করে না বোধ হয়। তাই তুলে ফেলতে চায়।

ঃ না। আমার মেয়ে আপনার দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে সাতরাজার ধন খোঁজে। তাই আপনার কোলে ওঠা মাত্র দাড়ি হাতড়ায়।

তৃপ্তির হাসি হাসেন হাজী নওয়াব মিয়া ও মাসুদা খাতুন। আঁখির দাদা দাদী নেই। এরাই যেন আঁখির প্রকৃত দাদা দাদী। আঁখিও এঁদের কাছে পায় অনাবিল স্নেহ মমতা। আপন দাদা দাদীর চেয়ে কোন অংশেই যেন এঁরা কম নন। আজো স্পষ্ট মনে আছে সামিনার, যেদিন আঁখি ভূমিষ্ঠ হয়, কি অক্লান্ত খাটুনিই না খেটেছিলেন মাসুদা খাতুন! সামিনার মাও এসেছিলেন মেয়ের বাড়ীতে মেয়ের

প্রথম গর্ভাবস্থা বলে। তিনি কোন কাজে হাত দিতে চাইলে ছুটে গেছেন হাজীপত্নী মাসুদা খাতুন।

ঃ করেন কি করেন কি, বেয়ান! আপনি আমাদের মেহমান। আপনি করতে যাবেন কেন! আমরা এতগুলি মানুষ কি জন্য আছি!

মাসুদা খাতুন, তাঁর মেয়ে সিফাত, রাহাতের ভাবী মাহবুবের বৌকে দিয়ে গরম পানি থেকে শুরু করে সব কিছু করিয়েছেন। কোন কিছুতেই হাত দিতে দেন নি সামিনার মাকে। সেজন্য সামিনার মা বলেছিলেন-

ঃ সত্যি বেয়ান! আপনি আছেন বলেই আমি এই সুদূরে মেয়ে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছি। আমার সামিনার কোন কিছুর অভাব আপনি রাখেন নি। না মায়ের, না শাশুড়ীর।

সামিনাও হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছে। মাসুদা খাতুনের মত এক মহীরূহের ছায়ায় সে আশ্রয় পেয়েছে। এ কম কথা নয়। মাসুদা খাতুনও তাই মাঝে মধ্যে বলেন-

ঃ দেখ, বৌমা, তুমি শুধু আমাদের রাহাতেরই বৌ নও। তুমি আমাদের আরেক সিফাতও। তোমার তো কিছুই অজানা নেই। একদিন আমাদের সিফাতকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম রাহাতের সঙ্গে। কিন্তু আমার ননদিনী যখন তার ছোট ছেলের জন্য জোর করে নিয়ে গেল সিফাতকে তখন আমরা আর না করতে পারিনি। আর তারপরে যখন তুমি বৌ হয়ে এলে, তোমার চাচা আর আমি বলাবলি করেছি, তুমি যেন সত্যিই আমাদের আরেক সিফাত। এই সিফাত তো সব সময় আমাদের কাছেই থাকবে।

আজ সেই চাচীর গগনবিদারী বিলাপে অস্থির হয়ে ওঠে রাহাত ও সামিনা। বুঝতে পারেনা চাচীর অসময়কার এই বুকফাটা কান্নার হেতু। ধুক ধুক করতে থাকে অজানা আশংকায় বুকের ভেতরে। ঘুমন্ত শিশু আঁখিকে নিদ্রিতাবস্থায় বিছানায় রেখে দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে ছুটে যায় রাহাত ও সামিনা হাজী নওয়াব মিয়ার ঘরের দিকে। শাকিলের কিছু হয়নি তো! মুক্তিযুদ্ধে গেছে শাকিল। হাজী নওয়াব মিয়া ও মাসুদা খাতুনের একমাত্র পুত্র সন্তান শাকিল। চতুর্দিকে শুরু করেছে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলাযুদ্ধ। অপারেশন চলছে বিভিন্ন

জায়গায়। গ্রামেগঞ্জে নদী বন্দরে সর্বত্র চলছে মুক্তি বাহিনীর অপারেশন তৎপরতা। মাইন দিয়ে সেতু উড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে দিচ্ছে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের অগ্রযাত্রা। বৈদ্যুতিক স্তম্ভ ধ্বংস করে ডুবিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের অতল গহ্বরে। ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে আকস্মিক আক্রমণে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে হানাদারদের কোন কোন দলকে। ভিখারীর বেশে গ্রেনেড নিক্ষেপে বিকল করে দিচ্ছে কোথাও কোথাও হানাদার সৈন্যবাহী চলমান বাষ্পীয় যানকে। এই রকম কোন অপারেশনে অংশ নিতে গিয়ে শাকিলের কিছু হয়নি তো! রাহাত সামিনার ভাবনার আকাশ আচ্ছাদিত হয়ে যায় অমঙ্গলের কৃষ্ণ মেঘে। ছুটে গিয়ে হাজী সাহেবের উঠানে পৌঁছুতেই শুনতে পায় রাহাত।

ঃ মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে মেরে ফেলেছে হাজী সাহেবকে।

চমকে ওঠে রাহাত। তাহলে সত্যিই হল সে চিঠির বক্তব্য। কিছু দিন আগে একখানা চিঠি পেয়েছিলেন হাজী নওয়াব মিয়া। সে চিঠিখানা তিনি রাহাতকে দেখিয়েছেন। চিঠির সঙ্গে একটুকরা সাদা কাপড়ও ছিল। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। কাফনের কাপড় দিলাম। সংক্ষিপ্ত কটি কথা।

ঃ এসবের কোন অর্থ হয়, রাহাত? আমার অপরাধ আমি কেন শান্তি কমিটির সঙ্গে যুক্ত আছি। ---- আরে, বাবা! আমরা যদি শান্তি কমিটি না করি তাহলে কি একটি মানুষও দেশে থাকতে পারবে! আর্মিরা সবাইকে শত্রু ভেবে মেরে ফেলবে না! কটি মানুষকে ভারত আশ্রয় দেবে!

ঃ তা তো ঠিক। কোটি কোটি মানুষকে তো আর ভারত আশ্রয় দিতে পারবে না।

ঃ তোমরা যাই বল, বাবা! ভারত যে আমাদের দরদী হয়েই আশ্রয় দিচ্ছে তা নয়। তাদের উদ্দেশ্য পাকিস্তান ধ্বংস করা। বাংলাদেশের মত একটি দুর্বল দেশ সৃষ্টি করতে পারলে সেটিকে গ্রাস করতে ইন্ডিয়ার মত রাঘব বোয়ালের আদৌ বেগ পেতে হবে না। এটিই তাদের গোপন উদ্দেশ্য।

ঃ তবুও চাচা, আপনার এসব থেকে দূরে থাকাই ভাল। আপনার নিজের ছেলেই যখন এসব পছন্দ করে না।

ঃ তোমরা পাগল হয়েছ! শাকিল কি বুঝে! কালকের ছোঁড়া। আরে বাবা, আমাদের শান্তি কমিটির আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে কত মুক্তিযোদ্ধা যে সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছে সে কথা তোমরা জান!

কেমন যেন রাহাতের সন্দেহের পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সন্তানের হাতেই শেষ পর্যন্ত জন্মদাতা পিতাকে প্রাণ দিতে হল না তো! সামিনার গলা জড়িয়ে ধরে অনবরত বিলাপে বাতাস ভারী করে তোলেন চাচী মাসুদা খাতুন।

ঃ এ কি হল, বৌমা! আমার এ সর্বনাশ কে করল?

সান্ত্বনা দেয় সামিনা। সান্ত্বনা দেয় মাহবুবের বৌও। তবুও থামেনা মাসুদা খাতুনের কান্না। উপস্থিত বর্ষিয়সী আরো কয়েকজন মহিলা চেষ্টা করেন মাসুদা খাতুনের কান্না প্রশমিত করতে। কিন্তু ব্যর্থ হন সবাই। জনৈক বৃদ্ধা বলেন-

ঃ কাঁদতে দাও মা। উনাকে কাঁদতে দাও। কেঁদেকেটে হলেও বুকটা হালকা করুক।

রাহাতরা পরে শুনে হাজী নওয়াব মিয়ার হত্যার বৃত্তান্ত। সোবেহ সাদেকের সময় অজু করে হাজী সাহেব মসজিদে গিয়েছিলেন জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করতে। অন্যান্য দিন যেমন গেছেন তেমনি নামাজ আদায় করে তাঁরই সমবয়সী আরো দুজন মুসল্লীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ী ফিরছিলেন হাজী সাহেব। এমন সময় রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি দালানের পেছন দিক থেকে চাদর মুড়ি দেয়া তিনজন যুবক বেরিয়ে এসে হাজী সাহেবদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হাজী সাহেব ও তাঁর সঙ্গী অপর মুসল্লী দুজন মনে করেছিলেন কোন পথচারী হবে বোধহয়। সেজন্য তাঁদের খেয়াল ছিল না সেদিকে। তাঁরা চলছিলেন নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে করতে আনমনে। যুবকত্রয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে আবৃত ছিল বলে চেহারাও দেখা যায়নি। হঠাৎ তাদের থেকে একজন হাজী সাহেবের নিকটবর্তী হতেই চাদরের ভেতর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে হাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি করে। পর পর অপর দুজনও, একজন হাজী সাহেবের বুকে, অন্যজন পেটে গুলি করে পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাজী সাহেব মাটিতে লুটে পড়ে ধড়ফড়

কাঁপতে কাঁপতে নিঃসাড় হয়ে যান। হাজী সাহেবের সঙ্গী দুজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বেকুবের মত হা করে চেয়ে থাকেন।

ঃ কি হল, কি হল? গুলির আওয়াজ কোত্থেকে আসল?

চতুর্দিক থেকে কিছু কিছু লোকজনও ছুটে আসে বলতে বলতে। এমন কি মসজিদের ইমাম সাহেবও গুলির শব্দে সচকিত হয়ে ছুটে আসেন অকুস্থলে। গুলিবিদ্ধ হাজী নওয়াব মিয়ার মৃতদেহ দেখে বলে ওঠেন-

ঃ আহা। একজন নেকবখত লোকের মৃত্যু হল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

সবাই জিজ্ঞেস করে হাজী সাহেবের সঙ্গী মুসল্লী দুজনকে।

ঃ কে বা কারা গুলি করেছে আপনারা চিনতে পারেন নি?

ঃ না, তাদের সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা ছিল।

ঃ বুঝতে পেরেছি। মুক্তিযোদ্ধারাই হাজী সাহেবকে গুলি করেছে। কিছুদিন পূর্বে তারা হাজী সাহেবকে সাবধান করে চিঠিও দিয়েছিল। তবুও তিনি সাবধান হননি।

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে ওঠেন। পরক্ষণে সবাই সমর্থন করল তাদের।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরাও শুনেছি।

খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসে হাজী নওয়াব মিয়ার মৃত দেহ দেখার জন্য। মেয়েলোকদের দেখা শেষ হয়ে গেলে পর হাজী সাহেবের লাশটাকে বাইরের ঘরে উত্তর শিথান করে ঘরের মেঝেতে সাদা চাদরে ঢেকে শুইয়ে রাখা হয়। রাতাত লোক মারফত খবর পাঠায় হাজী সাহেবের মেয়ে তিনটাসহ আত্মীয় স্বজনদের কাছে। জানিয়ে দেয়া হয়, জোহরের নামাজের পর মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জানাজার নামাজ শেষে মসজিদের গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। দুপুর বারটার মধ্যে মেয়ে তিনটাসহ তাদের শ্বশুর বাড়ীর লোকজনে ভরে যায় হাজী সাহেবের বাড়ী। শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দও আসেন হাজী সাহেবকে শেষ দেখা দেখার জন্য।

হাজী সাহেবের বোন ও মেয়েদের ক্রন্দনে অন্দরমহল ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু নেই শুধু হাজী সাহেবের একমাত্র পুত্র শাকিল। শাকিল কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে তাও কেউ বলতে পারে না।

ঃ শেষ দেখা কি সে একবার দেখতেও পারবে না তার বাপকে আমার শাকিল! তোরা আমার শাকিলকে এনে দে।

বুক চাপড়াতে থাকেন হাজী-পত্নী মাসুদা খাতুন। মেয়েরাও কাঁদতে থাকে মাকে জড়িয়ে ধরে। জোহরের নামাজের পর জানাজা হয় হাজী নওয়াব মিয়ার। মাইকে প্রচার করাতে বিস্তর লোকের সমাগম ঘটে জানাজার নামাজে। চেনা অচেনা হাজারো লোকে মাঠ ভর্তি হয়ে যায়। নামাজ শেষে মসজিদের গোরস্থানেই দাফন করা হয় হাজী সাহেবের মরদেহ। সবাই আশ্চর্য হয়। আত্মীয় অনাত্মীয় সবার মনে আন্দোলিত হয় শাকিলের কথা। শাকিল কি শেষ পর্যন্ত খবর পায়নি! নাকি হাজী সাহেবকে হত্যার পেছনে শাকিলেরও হাত আছে! কিন্তু না। গভীর রাতে শাকিলের আবির্ভাব ঘটে তার মার ঘরে। আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা সবাই দেখে শাকিলকে। দেখে আশ্চর্য হয়।

ঃ আব্বার মৃত্যুর খবর তুই পাসনি?

তিন বোনই একত্রে যেন ছুঁড়ে মারে প্রশ্নবাণ শাকিলকে। অন্যান্যরা হাঁ করে চেয়ে থাকে তার দিকে।

ঃ পেয়েছি। আব্বার মরা মুখও দেখেছি এবং জানাজায়ও শরীক হয়েছি।

ঃ বলিস কি! কেউ তো তোকে দেখতে পায়নি।

ঃ দেখেছে। চিনতে পারেনি।

ঃ এ্যাঁ! কি সব আবোল তাবোল বকছিস।

ঃ আবোল তাবোল নয়। ছদ্মবেশে ছিলাম। আর এও জানি আব্বাকে কারা মেরেছে। যারা মেরেছে তারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নয়। মুক্তিযোদ্ধাবেশে আমাদের পুরনো শত্রু জামালরা। কোন মুক্তিযোদ্ধাই আব্বাকে মারতে পারে না। আব্বারা পাকিস্তানপন্থী হলেও আব্বাদের পিস কমিটির আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রাম শহরে যেভাবে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে,

আর কোথাও তেমনি পারছে না। এজন্যই আব্বার জানাজায় অধিকাংশ লোক মুক্তিযোদ্ধাই ছিল।

ঃ বাপরে, আমাদের একি হল!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শাকিলকে জড়িয়ে ধরেন মাসুদা খাতুন। শাকিলের কণ্ঠও আর্দ্র হয়ে যায়। তবুও সে সান্ত্বনা দেয় মাকে।

ঃ কেঁদো না মা। জামালরা বাঁচতে পারবে না। আমাদের কমাণ্ডারের নিষেধ। তাই আমরা চুপ করে আছি। আমরা কি জানি না জামালরা কি করেছে! দেশে লুঠতরাজ করে আর্মিদের ভয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে আজ মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। ওদের মত কতিপয় দুষ্ট গ্রহ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধার মুখে চুনকালি মাখতে পারবে না। সময়ে ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে, দেখে নিও।

দশ

একের পর এক গড়াতে পড়াতে অনেকগুলো দিন কালের অতলে তলিয়ে যায়। হাজী নওয়াব মিয়ার বিয়োগ ক্ষতের দগ দগে অংশের উপরিভাগে ধীরে ধীরে পুরু আস্তর পড়তে থাকে। মাসুদা খাতুন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছেন এখন আগের চেয়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে মেয়েরা তাঁকে নিয়ে যেতে তাদের সঙ্গে। অন্তত যে কোন একজনের সঙ্গে রাখতে। কিন্তু না, মাসুদা খাতুন কারো সঙ্গে যাবেন না। কোথাও না। হাজী সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত এবাড়ী ছেড়ে কোথাও যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাসুদা খাতুনের ছোট মেয়ে সিফাতকে রেখে গেছেন হাজী সাহেবের বোন সিফাতের শাশুড়ী মাসুদা খাতুনের কাছে।

ঃ ভাবীকে এভাবে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি কয়েকদিন তোমার মার কাছে থাক, মা।

ঃ হ্যাঁ, সিফাত থাকবে। আমিও রোজ আসব।

সিফাতের স্বামী ফারুকও রোজ আসে মাসুদা খাতুনের খবরাখবর নিতে এবং কোন কোন দিন রাত্রে থেকেও যায় সামিনার সঙ্গে গল্প গুজব করে। বলতে কি সামিনারও প্রায় চব্বিশ ঘন্টার অর্ধেক কাটে মাসুদা খাতুনের সান্নিধ্যে।

আত্মীয়তার দিক দিয়ে যদিও মাসুদা খাতুন সামিনাদের কেউ না। না মায়ের গোষ্ঠীর দিক থেকে, না বাপের গোষ্ঠীর দিক থেকে। অথচ মাসুদা খাতুন কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যরাই নিকট থেকে নিকটতম হয়ে গেছে সামিনাদের। রাহাত রোজ ডিউটিতে চলে যায় সকালের দিকে। মিলের কাজকর্ম চলছে এক শিফ্‌টে। জেনারেল শিফ্‌ট। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। পূর্বের মত এ, বি, সি শিফ্‌ট এখন চলে না। শ্রমিকের অভাব। এমন কি বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ। পাওয়ার হাউজ উড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। কোন কোন সময় সপ্তাহ পর্যন্ত চলে অচলাবস্থা। বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়েছে কি কাঁচা মাল নেই। শুভপুর ব্রিজ ভেঙ্গে দিয়েছে দেশের শত্রুরা। একদিকে ব্রিজ ভাঙ্গা তো, অপর দিকে রেল লাইন উপড়ানো। কাঁচামাল আসতে পারছে না। এদিকে সরকারী প্রচার মাধ্যমে সর্বক্ষণ প্রচার চলছে, স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে দেশে। অফিস আদালত, মিল ফ্যাক্টরী, হাটবাজার, সবকিছু পুরাদমে চলছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই! বাস্তবে কি হচ্ছে! হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে খান সেনারা পথে প্রান্তরে, অলিতে গলিতে, গ্রামেগঞ্জে মুক্তি সেনার খোঁজে। হাজার চেষ্টা করেও কেন যেন ধরতে পারেনা মুক্তিযোদ্ধা নামের বিচ্ছু ছোকরাদের। না আছে তাদের কোন প্রকার ইউনিফর্ম, না আছে চেহারা সুরতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কুলি মজুর, রিকশা চালক, জেলে, চাষা ইত্যাকার বেশে এই দুরন্ত ছোকরাগুলো অতিষ্ঠ করে তুলেছে সুশিক্ষিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে। আশ্চর্য এই বাঙ্গালী জাতি। কেউ দেখিয়ে কিংবা ধরিয়েও দেয় না এই মুক্তিযোদ্ধা নামক দুষ্কৃতিকারীদের একজনকেও। কোন কোন সময় দেখা যায় জঙ্গলের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিচ্ছুগুলি বের হয়ে আকস্মিক আক্রমণ করে বসে পাকিস্তানী সেনাদের কোন একটি ছোট পথচারী দলকে। এতে হয়ত দুএকজন সৈন্য মারা গেল কিংবা আহত হল। অপ্রস্তুত অন্য সৈন্যরা পরক্ষণে প্রস্তুত হয়ে আক্রমণকারী বিচ্ছুদের ধরতে গিয়ে দেখে, ওরা আর সেখানে নেই। কোন্ ফাঁকে ঢুকে পড়েছে আশপাশের কোন বাড়ীতে। ফলে সে বাড়ীর মানুষগুলি হয়ে যায় আক্রান্ত, খান সেনাদের আক্রোশের শিকার। শুরু হয় নিরীহ গৃহবাসীদের ওপর অত্যাচার।

ঃ কাঁহা গেয়া ওয়েহ্ মুক্তিযোদ্ধা?

কোন জবাব দিতে পারে না গৃহবাসী। ধরিয়ে দেয়া যায় না মুক্তিযোদ্ধাদের।

ঃ এসেছিল। কিন্তু পালিয়ে গেছে।

ঃ নেহী। তোম ঝুট বোলতা। হাম জানতে তোম ওহ্ লোগকো কাঁহি ছোপা রাকখা হ্যায়।

ঃ না, খান সাহেব। আমি মিথ্যে বলছি না।

ঃ তোমহারি বাত পর হামী একীন নেহী আতা।

ঃ দেখুন, খান সাহেব, আপনিও মুসলমান, আমিও মুসলমান। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সঙ্গে মিথ্যে বলতে পারে না।

ঃ নেহী, তোম বাঙ্গালী লোগ গাদ্দার হ্যায়।

শুরু হয় গৃহস্বামীর ওপর জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি। গৃহের কোণা কাঞ্চি থেকে আরম্ভ করে উঠান, পুকুর পাড়, গোয়াল ঘর, আশপাশের বাঁশ ঝাড় ও ধানক্ষেত কোন কিছুই বাদ পড়ে না বিচ্ছুদের খোঁজাখুঁজি থেকে। কিন্তু নিষ্ফল। কোথাও পাওয়া যায় না তাদের। কোন ফাঁকে যে উধাও হয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না। শাকিল বলে সামিনাকে-

ঃ জানেন, ভাবী, আর্মিরা যখন আমাদের ওভাবে খুঁজছিল আমরা তখন কি করছিলাম।

ঃ কি করছিলে?

ঃ আমাদের কেউ কেউ ওঠে বসেছিল জাম গাছের আগার ডালে, আবার কেউ কেউ আম কাঁঠালের গাছে। আবার কেউ কেউ পুকুরের কলমি শাকের তলে নাক বের করে। কিন্তু প্রস্তুত হয়ে। আক্রমণ করলে প্রত্যাক্রমণের জন্য আমরাও তৈরি ছিলাম।

ঃ দুষ্টরা সব একত্রিত হয়ে দুষ্টমী করার জায়গা পাচ্ছিলা না আর কি।

ঃ না, ভাবী, এগুলা দুষ্টমী নয়। এগুলা আমাদের গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল।

শাকিলের মত ছেলেদের কলাকৌশলের কথা শুনে হাসাহাসি করলেও ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনি সামিনারা। কিন্তু এর শেষ কোথায়? কবে হবে

এর পরিসমাপ্তি? চতুর্দিকে কেমন যেন একটা ভীতি, একটা আতঙ্ক। এভাবে তো জীবনের প্রবাহ এগুতে পারে না। কবে পারবে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। সরকারী মাধ্যমগুলোতে যতই উচুঁস্বরে বলা হোক না কেন যে দেশে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে; সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়া শরণার্থীরা ফিরে আসছে আবার স্ব স্ব বাসগৃহে; কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণ বিপরীত। অফিস আদালতে যে ছিটেফোঁটা কাজকর্ম চলছে তাও অবাঙ্গালী ষ্টাফদের দ্বারা। বাঙ্গালী কর্মচারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। কলকারখানাতেও একই অবস্থা। ঢাকা চট্টগ্রামের মত শহরগুলিতে একচছত্রাধিপত্য এখন বিহারীদের। সামিনা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এখন বাপের বাড়ীর জন্য। জানে না ওখানকার পরিস্থিতি এখন কি রকম। কোন খবরাখবর পায়নি আজো বাপের বাড়ীর। মেজ মিয়া ভাই আজিজ গেছে বাপের বাড়ীতে। ঈশ্বরদীতে্। উত্তর বঙ্গের প্রধান রেলওয়ে জংশন ঈশ্বরদীতে। এই রেলওয়ে জংশনকে কেন্দ্র করেই তো গড়ে ওঠেছে ছোট্ট মফঃস্বল শহর ঈশ্বরদী। এই জংশনের মধ্য দিয়েই সমগ্র উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করে রেল গাড়ীতে করে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা।

ভেবে কূলকিনারা করতে পারেনা সামিনা। মেজ মিয়া ভাইটাও যেন কি! চিটাগাং থেকে বাড়ী গেছে আজ প্রায় দু'তিন মাস হয়ে যাচ্ছে। কোন খবরা খবর পাচ্ছেনা। বাড়ীতে বুড়া বাবা মা, ছোট বোন ইমা, মেজ ভাবী, ছোট ভাবী, ছোট মিয়া ভাই সবাই রয়েছে। জানে না ওরা কে কি অবস্থায় আছে। বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয়ের জন্য গেছে কিনা, না, বাড়ীতেই রয়েছে, কে জানে। বাবাটা যে প্রকৃতির মানুষ! কোথাও যাবেন কিনা সন্দেহ আছে।

ঃ কেন যাব, আমরা কি কোন অপরাধ করেছি? সবাইতো আমাদের চেনে। কারো সঙ্গে কি আমাদের শত্রুতা আছে?

হয়ত বাবা বলবেন। মায়ের জেদাজেদিতেও হয়ত বাবা রাজী হবেন না। বাবাকে তো সামিনা চেনে। ভাল করেই চেনে। শৈশব থেকে দেখে এসেছে। এক গোঁ বাবার। যেটা বোঝেন সেটাই করবেন। ঈশ্বরদী শহরটিও বিহারী প্রধান এলাকায় পরিণত হয়ে গেছে আজকাল। অধিকাংশ রেল কর্মচারীই বিহারী। স্থানীয় বাঙ্গালী যারা আছে তাদের অধিকাংশই পৌর এলাকার বাইরে

গ্রামাঞ্চলে। শহরে যে বাঙ্গালী নেই তা নয়। থাকলেও অবাঙ্গালীদের প্রভাবটাই যেন বেশী। তারাও আবার দীর্ঘদিন ধরে আছে বলেই বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের মতই হয়ে গেছে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের ছেলে মেয়েরাও লেখাপড়া করে। সখ্যও গড়ে ওঠেছে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তবুও বিশ্বাস কি! কেমন যেন একটা সন্দেহ খচখচ করে অন্তরের মধ্যে। এখানে ওরা যা করছে ওখানেও যদি তা করে। আর ভাবতে পারে না সামিনা। আর্মিদের ভুল পথে পরিচালিত করার পেছনে তো এই বিহারীরাই। এই বিহারীরাই তো আর্মিদের সাত পাঁচ বুঝিয়ে বাঙ্গালীদের পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহই জানে মেজ মিয়া ভাইটা সত্যি সত্যি বাড়ী গিয়ে পৌছুতে পেরেছে কি না। সুদূর এই চট্টগ্রাম থেকে উত্তর বাংলার ঈশ্বরদী শহরে হেঁটে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! এখন না হয় রেল ষ্টিমার বাস সব চালু হয়েছে। তখন তো কিছুই ছিল না।

ঃ আমার কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। মেজ মিয়া ভাই সত্যি সত্যি বাড়ী পৌছুতে পেরেছে তো। না পথে কোন---

সামিনার মনের আকাশ আচ্ছাদিত হয়ে যায় সন্দেহের কালো মেঘে। বর্ষণাতুর চোখে সে হাত চেপে ধরে রাহাতের। রাহাত ওকে সান্ত্বনা দেয় নানা কথা বলে।

ঃ পাগল হয়েছ তুমি! মেজ মিয়া ভাই কি কচি খোকা!

তবুও শান্ত হয়না সামিনার উত্তাল মনখানা। হেঁটে যাওয়ার সময় পথে কোন অঘটন ঘটেনি তো। কিছু না। কোন অঘটন ঘটেনি। একদিন চিঠি আসল। মেজ মিয়া ভাই আজিজের চিঠি আসল সামিনার নামে। সে কি আনন্দ সামিনার! মা বাপ ভাই বোন ভাবী সবার খবরাখবর নিশ্চয়ই আছে এচিঠির মধ্যে। কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করে সামিনা।

স্নেহের মিনা,

তোরা আমার প্রীতি ও দোয়া নিস। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে চড়াইউৎরাই পেরিয়ে খাল বিল নদী নালা বন জঙ্গল মাঠঘাট টিলাটক্কর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র অসীম রহমতে শেষ পর্যন্ত বাড়ী পৌছুতে পেরেছি। তোরা বিশ্বাস

করতে পারবি কিনা জানি না। অনেক বেলা কাটাতে হয়েছে আমাদের উপোস করে। কে দেবে আমাদের খাবার। সময় তো চলছে ইয়া নফসির। তবুও কোন কোন স্থানে গৃহবাসী তাদের সামর্থ্যানুযায়ী দয়াপরবশ হয়ে চিড়ে মুড়ি দিয়েছে। কেউ কেউ ডাল ভাতও খাইয়েছে। আমরা মানুষ ছিলাম পাঁচ সাত জন। কোন কোন রাত কেটেছে রাস্তার ধারে। কোন কোন রাত হাট বাজারের দোকানের বারান্দায় আবার কোন কোন রাত মসজিদে। এমনিভাবে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমাদের হাঁটতে হয়েছে। মনে করিস না যে আমরাই শুধু এমনি করে বাড়ী গেছি। আমাদের মত আরো বহু লোককে ছোট ছোট দল বেঁধে বাড়ী ঘরে যেতে দেখেছি। সে এক অকল্পনীয় অবস্থা! নিঃস্ব মানুষ সব শূন্যহাতে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছে যেন। পকেট ফাঁকা। খালি হাত। শেষ পর্যন্ত বাড়ী পৌছুলাম।

কিন্তু একি! এ কোথায় আসলাম! শূন্য বাড়ী খাঁ খাঁ করছে কেন। বাড়ীর মানুষ গুলি গেছে কোথায়? নিজের চোখকে বিশ্বেস করতে পারছিলাম না। ঘর আছে মানুষ নেই। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাড়ীটার ওপর দিয়ে দৈত্য দানবেরা যেন যুদ্ধ করেছে আধিপত্য বিস্তারের প্রত্যাশায়। বিভিন্ন ফলের গাছ গাছড়াগুলির অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন হাজার মাইল বেগে ঝড় বয়ে গেছে ওগুলির ওপর দিয়ে। ফল ফলারির ছিটেফোঁটাও যেন নেই কোথাও। ডাল পালা ভেঙে মুচড়ে দুমড়ানো সব। ডালিম, বরই, পেয়ারা, শরীফা, আতা মোট কথা কোনটা বাদ নেই। ঘরের দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির। দরজা জানালা কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। গৃহবাসী মানুষতো নেই-ই। নেই ঘরের কোন জিনিসপত্রও। এটি কি আমাদের বাড়ী! এখানে কি ছিল আমাদের বাপ, মা, ভাই বোন, স্ত্রী বৌ সবাই! মনে হচ্ছিল যেন এক বিরানা দ্বীপে এসে পৌছেছি। এটি যে আমাদের বাড়ী, নিজের মনকে কোন মতেই বোঝাতে পারছিলাম না। আব্বা আম্মা ইমা এরা গেল কোথায়? খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম আশে পাশে। পাড়া প্রতিবেশীদের কাউকেও কোথাও পেলাম না যে কিছু জিজ্ঞেস করি। প্রতিবেশী সুমি, পল্টু, আফজল, সন্তু প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। সবাই চলে গেছে বাড়ীঘর ছেড়ে গ্রামের দিকে। আবার কেউ কেউ সীমান্তের ওপারেও। বাজারের দিকে গেলাম। ওখানে দেখা হল আব্বার বন্ধু বিহারী চাচার সঙ্গে।

ঃ আজিজ মিয়া না? তুমি কখন এসেছ?

ঃ আজকেই এসেছি, চাচা। বাড়ী গিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। আশে পাশেও কাউকে পেলাম না যে কিছু জিজ্ঞেস করি। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা, চাচা। ওরা সব গেল কোথায়? আপনি কিছু জানেন?

ঃ এস এস। আমার সঙ্গে এস। আমাদের ওখানে সব আছে।

বিহারী চাচার সঙ্গে গেলাম তাদের বাসায়। গিয়ে দেখি আম্মা, ইমা, তোর ভাবীরা সব ওখানে আছে। কিন্তু আব্বা ও দুদু নেই। আমাকে দেখে আম্মা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

ঃ আজিজ রে, আমাদের সব শেষ।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ইমা ও তোর ভাবীরাও বিলাপ ধরে কান্না জুড়ে দিল। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম তাদের দিকে। ইমা বলল রোরুদ্যমান কণ্ঠে-

ঃ ওরা আব্বা ও ছোট মিয়া ভাইকে মেরে ফেলেছে।

আমাকে কে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল।

ঃ ওরা। কারা? কারা মেরে ফেলেছে কাদের? আব্বা ও দুদু কোথায়?

ঃ দুদু বহুবার বলেছে তোর আব্বাকে সবাইকে, দুদুর শ্বশুর বাড়ী চলে যেতে। কিন্তু তোর আব্বা রাজী হয়নি।

কেঁদে কেঁদে আম্মা বললেন; তোর ছোট ভাবী দুদুর বৌ কুলুও বলল।

ঃ আমিও বহু অনুরোধ করেছি আব্বাকে, মিয়া ভাই। তিনি রাজী হন নি। তাঁর এক কথা, "আমরা তো কারো কোন ক্ষতি করিনি। কেউ আমাদের কিছু করবে না। তোমরা দেখে নিও"। আপনার ভাইকেও বলেছি, আমরা মেয়েদের হলেও অন্ততপক্ষে রেখে এস। আপনার ভাই এক রকম রাজী হয়েছিল। রাত্রে কথাবার্তা হয়েছে। সকালে আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে সুযোগ আর ঐ পাষণ্ডরা দিল না, মিয়া ভাই। সেই সুযোগ আর দিল না। আপনার ভাই আর আব্বাকে ডেকে নিয়ে কোথায় যে নিয়ে গেল ওরা, তার খোঁজ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

ঃ আর কোথায়! নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। মেরে হয়ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছে।

ঃ ভাগ্যিস এই বিহারী চাচা ছিলেন। তিনি এবং আরও দুচারজন বিহারী ভাল মানুষ আমাদের গায়ে ওদের হাত দিতে দেননি। উনারা আমাদেরকে এই চাচার বাসায় এনে আশ্রয় দিয়েছেন। ওঁরা না থাকলে কি অবস্থা হত আল্লাহ জানে।

আম্মা, ইমা ও তোর ভাবীদের কান্নায় আকাশের সূর্য পর্যন্ত খসে পড়ার উপক্রম। কিংকের্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম। না পারলাম কাঁদতে। না পারলাম হাসতে। এমনকি না পারলাম কথা পর্যন্ত বলতে। চোখের পানি পর্যন্ত কেউ যেন শুষে নিয়ে গেছে আমার চোখ থেকে। তোর বান্ধবী, বিহারী চাচার মেয়ে মুন্নি আম্মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। বলল-

ঃ আপনি কাঁদবেন না, চাচী। আমরা আছি না!

আম্মার মন কি সহজে শান্ত হয়! কারো সম্মুখ থেকে স্বামী সন্তানকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেললে কেউ কি ধৈর্য ধরতে পারে! ভাগ্য ভাল যে সে সময় বড় ভাইজান সৌদি আরব থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁকে টেলিফোন করলে তিনি এসে আম্মা ও ইমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বড় ভাবীর কাছে রেখেছেন। এদিকে আমি দুদুর বৌ ও তোর মেজ ভাবীকে দুদুর শ্বশুর বাড়ীতেই রেখে এসেছি। জানি না কদ্দিন এভাবে থাকতে হবে। বাড়ী ঘরের তো কিছুই নেই। সব কিছু নতুন করে গড়তে হবে আবার। আমিও দুচার দিন দুদুর শ্বশুর বাড়ীতেই আপাতত আছি। শিগ্‌গির চিটাগাং ফিরে গিয়ে অফিসে জয়েন করব বলে ভাবছি। বার বার রেডিওতে ঘোষণা করছে, অফিসে যোগদান না করলে নাকি চাকরী যাবে। চাকরী তো আর খোয়ানো যায় না। ---- মিনা, কেন এমন হল বলতে পারিস। কোন অপরাধে আমাদের বাপ ভাইকে বরণ করতে হল এই অপমৃত্যু। আল্লাহর কাছে কি এর কোন বিচার নেই!

ইতি-

তোর মেজ মিয়া ভাই।

ঃ আল্লাহ্ গো!

আর্তনাদ করে বিছানায় লুটে পড়ল সামিনা। রাহাত ওকে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয়না সামিনা। তার বিলাপে চার দিকে যেন শোকের ছায়া নামে।

ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চেয়ে থাকে আঁখি ওর মার দিকে। কিছুই বুঝতে পারেনা সে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সেও কান্না জুড়ে দেয় তার মার সঙ্গে। মা মেয়ের কান্নায় সমস্ত ঘর হয়ে যায় বিষাদিত। দিশেহারা হয়ে রাহাত ওদের কান্না থামাতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে একসময় নিজেরই অজান্তে। টস্ টস্ করে পড়তে থাকে চোখের পানি।

এগার

শুক্রবার। অফিস আদালত থেকে শুরু করে মিল ফ্যাক্টরী সব বন্ধ। সবার সাপ্তাহিক ছুটি। রাহাত একরূপ জোর করেই সামিনাকে নিয়ে যায় ডাক্তার আমীর বাসায় বেড়াতে। মন খারাপ বলে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না সামিনার। বাপ ভাইয়ের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়া সামিনাকে স্বাভাবিক করতে চায় রাহাত। তাই তারই পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছে সামিনাকে।

ঃ কেন আসবেন না, ভাবী। বাপ মা তো কারো চিরদিন বেঁচে থাকে না।

ডাঃ পত্নী জেরীন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে সামিনাকে। তবুও শান্ত হয় না সামিনার মন। কি করে ভুলবে সামিনা বাপ ভাইয়ের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। যে বাপ সুযোগ পেলে মার তৈরী লেবুর আচার, নাড়ু, গাছের পেয়ারা, ডালিম, শরীফা ইত্যাদি নিয়ে ছুটে আসতেন সুদূর চট্টগ্রামে সামিনাকে দেখতে; এমনকি বাড়ীর উঠানের ডান দিককার বরই গাছটার নারকেলে বরই পর্যন্ত বাদ যেত না যার আনা থেকে, সেই বাপ যে আর বেঁচে নেই এটা কোন মতেই যেন ভাবতে পারে না সামিনা। সামিনা কি করে ভুলবে, "তোদের বাদ দিয়ে এগুলো কি করে আমরা খাই, মা। তাই এই সামান্য কিছুমাত্র তোদের জন্য এনেছি।

ঃ দে তো, মা, একবদনা অজুর পানি দে। নামাজটা সেরে নিই।

আব্বার এই স্নেহমাখা সম্বোধন কি সামিনা আর কোন দিন শুনতে পাবে। বিয়ের আগে এটি সেটি নিয়ে কত আবদারই না সামিনা করেছে আব্বার কাছে! স্নেহময় পিতা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন-

ঃ তোরা হচ্ছিস আমার এক একটা শ্বাস প্রশ্বাস। তোদের বিয়ে হয়ে গেলে কি করে যে আমি থাকব সেটিই আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

ঃ বারে, মিনা আপুই বুঝি আপনার একমাত্র মেয়ে। আমরা কেউ নই।

ঃ ইমা দুষ্টুমী করে বললে আব্বা সহাস্যে ইমাকেও টেনে নিতেন বুকে। বলতেন।

ঃ নারে। তোরাই হচ্ছিস আমার প্রাণ। তোরা চোখের আড়াল হলে পুকুর থেকে তোলা মাছের অবস্থা হয় আমার।

বাজারে যাওয়ার সময় আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট খুকীটির মত ইমা বলত-

ঃ আব্বা, আপনি কিন্তু আমাদের জন্য মসল্লা ফুলুরী আনতে ভুলবেন না যেন।

ঃ নারে, মা, তোদের ঝাল ডালের বড়া না আনলে যে তোরা আমার বাজারের থলেটাশুদ্ধ উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিবি সেটি আমি জানি।

এসব স্মৃতি কি সহজে মানসপট থেকে মুছে ফেলা যায়! মুছে ফেলা যাবে কি ছোট মিয়া ভাইয়ের একান্ত শাসন! সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে পড়তে বসতে হত সামিনা ও ছোট ভাবীকে। বিয়ের পরেও ছোট ভাবী লেখাপড়া করেছে সামিনার সঙ্গে একই কলেজে। পড়তে পড়তে রাত্রে তন্দ্রায় ছোট ভাবীর চোখগুলি বুজে আসলে অমনি পিঠে পড়েছে ছোট মিয়া ভাইয়ের সরু বেতের ফাঁত ফাঁত বাড়ি। চমকে ওঠে আবার পড়তে হয়েছে দুজন কেই। কখন যে ছোট মিয়া ভাই অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেছে ওদের কেউ একটুও টের পায়নি। ওদের নাজেহাল অবস্থা দেখে জায়নামাজে বসে হাতে তসবিহ নিয়ে আম্মাটা আরো মিটি মিটি হেসেছে।

ঃ আম্মাটা যেন কি! মিয়া ভাই যে কখন এসেছে আম্মাটা একটু বলেওনি।

ছোট মিয়া ভাইয়ের ওপর রাগ করে আম্মাকেও কত কথা বলেছে সামিনা। আব্বাটা বরং হেসে হেসে বলেছেন-

ঃ মারবে নাতো কি! পড়তে বসে তোরা ঘুমাবি কেন?

তাইতো। ছোট মিয়া ভাই তো ওদের ভালর জন্যই ওদের মেরেছে। আজ সেই মিয়া ভাই নেই। ছোট ভাবী বিধবা হয়ে গেছে কচি বয়সে। একটি এক বছরের ছেলে এখন কোলে, আরেকটি পেটে এখনো। জানে না সামিনা, কি অবস্থা হবে ছোট ভাবীর। ভাবতেই কেন যেন কেমন কেমন লাগে সামিনার। ছোট ভাবী কি ওদের আপনজন হয়ে থাকবে? থাকাও কি উচিত! কতই বা বয়স হয়েছে ছোট ভাবীর। প্রায়ই তো সামিনারই বয়সী। সমগ্র জীবনই তো পড়ে রয়েছে ওর। সামিনাদের বাসায় পুরা জীবনটাই কি ব্যর্থ করে দেবে ছোট ভাবী।

ঃ ভাবীর মা বাপেরা যদি ভাবীকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চান তাতে কারো দ্বিমত করা উচিত না।

রাহাতের মন্তব্যটা যে অস্বাভাবিক নয় সামিনা তা জানে। কিন্তু মনকে কি করে বোঝাবে যে বান্ধবীতুল্য ছোট ভাবী আর তাদের ছোট ভাবী থাকবে না। ছোট ভাবী হয়ে যাবে অন্যজনের স্ত্রী। তাদের জন্য পর। আর ছোট ভাবীর সন্তান দুটি, সামিনাদের ভাইপোদ্বয়ের কি অবস্থা হবে। পিতৃহীন শিশু দুটিকে মাতৃহীন করে দেয়া হবে মা বেঁচে থাকতে। এযে অকল্পনীয়!

ঃ এই মিনা, দেখনা, ছেলেটা কেমন হা করে তাকিয়ে আছে তোর দিকে।

একদিন হেঁটে কলেজে যাওয়ার সময় পথিপার্শ্বের একটি ছেলেকে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ছোট ভাবী আড় চোখের ইঙ্গিতে তার সঙ্গে দুষ্টুমী করে বলেছিল।

ঃ তোকে বোধ হয় খুব পছন্দ হয়েছে ছেলেটার।

ঃ যা, ভাবী; তুমি ভারী দুষ্ট!

এমন নিবিড় ঘনিষ্ঠ দুষ্ট ভাবীটাও যে একদিন সামিনাদের জন্য পর হয়ে মৃত সম হয়ে যাবে এ ভাববে কি করে সামিনা। সামিনার মনের আকাশে আজো

জ্বল জ্বল করে জ্বলছে ছোট ভাবীর বাপের বাড়ীতে ভাবীর সঙ্গে সামিনার প্রথম বেড়াতে যাওয়ার দৃশ্য। ম্যাট্রিক পাশের পরেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ছোট ভাবীর ছোট মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে। সামিনাও সে বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তাই সখ্যও গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে। অনেকেই বলত একবৃন্তে দুটিফুল। দুজনেই পরত সালোয়ার কামিজ প্রায় একই ধরণের। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকে বলাবলি করত। ছেলের বৌ বৌয়ের মত চলবে, মেয়ের মত চলবে কেন। সামিনার আব্বা এতে রেগে যেতেন।

ঃ এরা বলে কি? বৌ হয়ে এসেছে বলে কি সে মেয়ে নয়! ওটি আমার আরেক মেয়ে।

ঃ তবুও, চৌধুরী সাহেব, বৌদের বেশী লাই দিলে ওরা মাথায় ওঠে যায়। মুরব্বীদের মানতে চাইবে না।

জনৈক প্রতিবেশী হাজী সাহের একদিন সামিনার আব্বাকে ওকথা বললে সামিনার আব্বা হেসে জবাব দিয়েছিলেন-

ঃনা, হাজী সাহেব। সব মেয়ে এক রকম হয় না। মানার যারা তারা মানবেই। না মানারগুলো বৌ হলে যেমন মানবে না, মেয়ে হলেও তেমনি মানবে না। ছেলের বৌকে আমরা বৌ হিসেবে দেখব কেন, মেয়ে হিসেবে দেখতে পারিনা!

সামিনার আব্বার একথার ওপর মন্তব্য করার সাহস কারো হত না। সবাই চুপসে যেত। ছোট ভাবী বলত-

ঃ মনে হয় না যে আমি শ্বশুর বাড়ীতে আছি। যেন এটাও আমার বাপের বাড়ী। আর তোরা সবাই আমার ভাই বোন।

ঃ ছোট মিয়া ভাইও।

ঃ যা, দুষ্টু কোথাকার!

সেকি দুষ্টুমী ও হাসি মস্করা মনদ ভাবীর মধ্যে। প্রথম যেদিন ছোট ভাবীর সঙ্গে ছোট ভাবীর বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল সামিনা ও ইমা, গরুর গাড়ীতে করেই গিয়েছিল। দাওরিয়ার মেইন রোড থেকে গরুর গাড়ীতে করেই গিয়েছিল। দাওরিয়ার মেইন রোড থেকে গরুর গাড়ীতে চড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ভারইমারী

ভাবীর বাপের বাড়ীতে পৌছতে কত সময়ই না সেদিন লেগেছিল সামিনাদের। একে তো বন্ধুর কাঁচা গ্রাম্য পথ। তার ওপর কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল দু'এক পশলা। বার বার আটকে যাচ্ছিল গরুর গাড়ীর চাকা রাস্তার প্যাঁকের মধ্যে। অনেক কষ্টে বলদ দুটো টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের।

ঃ শ্বশুর বাড়ীতে যেতে এত কষ্ট হবে জানলে এখান থেকে বিয়েই করতাম না।

সেকি নাক সিটকানি ছোট মিয়া ভাইয়ের! মিয়া ভাইয়ের রাগ প্রশমনের জন্য সামিনা বলেছিল হেসে-

ঃ তুমি বিয়ে না করলে এমন একটি রসগোল্লা ভাবী আমরা কোথায় পেতাম, মিয়া ভাই।

ঃ রসগোল্লা, না, ছাই। আস্ত একটা পচা ডিম।

ভাবীকে রাগাবার জন্যই যেন সামিনাদের সামনে এসব কথা ইচ্ছে করেই বলেছিল ছোট মিয়া ভাই। ভাবীর চোখে মুখে ছায়া ফেলে মেঘের ঘনঘটা।

ঃ পচা ডিম বৈকি। তবুও তো এই পচা ডিমের জন্যই শেরওয়ানী পাগড়ী পরে ছুটে গিয়েছিল আমাদের বাড়ী।

ঃ আমি গিয়েছিলাম নাকি? তোরা বলতে পারিস না, মিনা, আমাকে যে অদৃশ্য সুতারটানে নিজেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়ীতে। ছোট বোন ইমা সহ সেকি হাসি ওরা সব ভাই-বোনদের! ছোট ভাবী হেসেছিল ঘোমটার আড়ালে মুচকি মুচকি। যেন তৃপ্তির হাসি। আজকে সেই ছোট ভাবী বিধবা। একি করে ভাববে সামিনা!

ঃ আমার বান্ধবী শিপ্রা। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গেই লেখাপড়া করেছি।

সামিনাদের সঙ্গে শিপ্রাকে পরিচয় করিয়ে দেয় ডাক্তার আলী-পত্নী জেরীন। শাখা সিন্দুর পরা হিন্দু মেয়ে এই প্রথম দেখল সামিনা এই কয় মাসের মধ্যে। রাহাতও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শিপ্রার দিকে। কি যেন খোঁজে তার মধ্যে।

ঃ আপনি------ আপনি------- আপনাকে যেন আমি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

ঃ আমাকে? কোথায়?

বিম্বৌষ্ঠে হালকা মুচকি হাসির ছটা ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করে শিপ্রা। খানিক ভেবে নিয়ে উত্তর দেয় রাহাত।

ঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমিন জুট মিলের কেমিষ্ট সুধীর বাবুর বাসায়। কেমন ঠিক না?

ঃ হ্যাঁ, সুধীর বাবু আমার ভগ্নিপতি। উনার স্ত্রী আমার বড় বোন।

ঃ তাইতো বলি। চেহারায় অদ্ভুত মিল। বৌদির গায়ের রং শারীরিক গঠন থেকে শুরু করে সব কিছুতে আশ্চর্য মিল। আচ্ছা, শুনলাম, উনারা নাকি ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন?

ঃ হ্যাঁ। আমাদেরও যেতে বলেছিল। কিন্তু আমরা রাজী হইনি। এখন ভাবছি, চলে গেলেই বোধ হয় ভাল করতাম।

ঃ কেন যাবি নিজের দেশ ও বাড়ীঘর ইত্যাদি ছেড়ে?

বাধা দেয় জেরীন। শিপ্রার চেহারায় ছায়া ফেলে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

ঃ এভাবে লুকোচুরি খেলে আর কদিন থাকতে পারব?

ঃ আমরা মরে গেছি নাকি! আমরা বাঁচলে তোরাও বাঁচবি। তোরা মরলে আমরাও মরব।

ঃ নাগো শ্যালিকা। আর বেশী দিন নেই। সময় ঘনিয়ে আসছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তবর্তী বহু এলাকা মুক্ত করে ফেলেছে।

পরিবেশ হালকা করতে চেষ্টা করে ডাঃ আলী। রাহাতও সমর্থন যোগায় আলীকে।

ঃ বিশ্বাস করুন, ভাই, ইচ্ছা করে না নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাই। যদিও আমাদের অনেকে এখানে থাকলেও তাদের অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন ইন্ডিয়ায়।

শিপ্রার স্বামী অনিলবাবু বলেন। অনেক ক্ষণ ধরে বিভিন্ন কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায় বেশ কিছু সময়। এক সময় বাসায় ফিরে আসে রাহাত ও সামিনা। মন ভাল নেই সামিনার। তাই জেরীন ভাবীর মত বান্ধবীর সাহচর্যও তাকে ধরে রাখতে পারেনি ডাঃ আলীর বাসায়।

ঃ বৌমা!

বাসায় ফিরে আসলে হাজী পত্নী মাসুদা খাতুন আসেন সামিনাদের ঘরে।

ঃ জ্বি, চাচী।

ঃ তোমরা কোথাও গিয়েছিলে নাকি, মা?

ঃ জ্বি, চাচী। আপনাদের ছেলে তার এক বন্ধুর বাসায় নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে।

ঃ খুব ভাল, খুব ভাল, মা। ঘরে বসে থাকলে তো মনের অন্ধকার কাটবেনা। মনকে একটু হালকা করতে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করা ভাল।

ঃ আমার কিছুই ভাল লাগছে না, চাচী।

ঃ ভাল না লাগারই কথা, মা। আপন জনের বিয়োগব্যথা বড় মর্মান্তিক। সহজে কি ভোলা যায়! — এই আমার অবস্থা দেখ না। তোমাদের চাচার মৃত্যুর পরে কি আমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছি!

ঃ কেন এমন হল, চাচী। কি অপরাধ করেছিল আমার বাপ ভাই? কি অপরাধ করেছিলেন চাচা?

ঃ সবুর কর, মা, সবুর কর। অধৈর্য হয়ো না। আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর। ---- আমার আপু কোথায়?

ঃ ওই যে ওখানে খেলা করছে।

ঃমাসুদা খাতুন এগিয়ে যান আঁখির কাছে। আঁখি খেলা করছিল আপন মনে বিছানায় বসে বসে, হাত পা নেড়ে নেড়ে। মাসুদা খাতুনকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোলে। মাসুদা খাতুন বুকে তুলে নেন আঁখিকে।

ঃ আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।

বার

আজকাল গোলাগুলির আওয়াজ তেমন শোনা যায় না বললেই চলে। কেমন একটা থম থমে ভাব চতুর্দিকে। কোথাও স্বাভাবিকতা নেই। সর্বত্র মনে হয় ভয় ভীতির কালো ছায়া গাঢ়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু চলছে বলে মনে হলেও গতিতে তীব্রতা নেই। অনিশ্চয়তা ঘিরে রেখেছে চতুর্দিক। মিল ফ্যাক্টরীতে রোজ কাজে যায় রাহাতরা। সেই জেনারেল শিফ্‌ট আজো অব্যাহত। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। উৎপাদনের পরিমাণও তথৈবচ। কলকারখানাতে একই অবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাও শোচনীয়। বশর বলে-

ঃ রোজ দোকানে যাই। খুলি। বসি। কিন্তু বেচা বিক্রি নেই। আর বেচা বিক্রিও বা হবে কি করে। মালপত্র থাকলেই তো বেচাবিক্রি হবে। যা ছিল প্রায়ই শেষ। নতুন কোন মাল তুলতে পারছি না। আমরা খুচরা ব্যবসায়ী। বাইরে থেকে মাল আসলেই পাইকারি মাল এনে দোকান সাজাতে পারি। এখানেও উৎপাদন নেই। ব্যবসা চালাতে পাচ্ছি না।

ঃ মাল আসছে না কেন বাইরে থেকে?

ঃ আসবে কি করে। মুক্তিযোদ্ধারা ষ্টিমার ফুটা করে দিচ্ছে মাইন দিয়ে। নতুন কোন ষ্টিমারই ভিড়তে পারছেনা জেটিতে। কদিন পাহারা দিয়ে রাখা যায়।

সবখানে বিরাজমান চাপা অস্থিরতা। একটা অবিশ্বাস, একটা সন্দেহ কেমন যেন কুরে কুরে খাচ্ছে প্রত্যেকের অন্তরকে। কেউ পারছে না কাউকে মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করতে। মিল থেকে বের হয়ে রোজ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে রাহাত। দেখা সাক্ষাৎ করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। সবার জবাব একটা।

ঃ বুঝতে পাচ্ছি না দেশ কোথায় যাচ্ছে।

আর্মিরা টহল দিচ্ছে রাস্তা ঘাটে, হাটে বাজারে চব্বিশ ঘন্টা। পলে পলে চেক পোষ্টে চেক করা হচ্ছে সব কিছু। তবুও স্বস্তি নেই। সমগ্র দেশটাই যেন একটি বন্দীশালা। আর বাংলা ভাষাভাষী লোকগুলি যেন সব কয়েদী। অস্ত্রধারী

সৈন্যরা যেখানে সেখানে যাকে ইচ্ছে তাকে ধরছে। যাকে খুশী ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে কাউকে আবার খানিক পরে ছেড়ে দিচ্ছে। আবার কাউকে কাউকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোন খবর নেই। রাত দশটার পর রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারফিউ আক্রান্ত সারাদেশ। বিচ্ছু ছেলেগুলিও যেন অদম্য হয়ে ওঠেছে। সারাদেশে তারা কিল বিল করছে পিঁপড়ার মত। ইউনিফর্ম না থাকায় কে মুক্তিযোদ্ধা, কে সাধারণ মানুষ কোন মতেই বুঝতে পারছিল না পাকিস্তানী সৈন্যগুলি। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রতিশোধ নিচ্ছিল তারা সাধারণ মানুষদের ওপর।

ঃ কেঁউ তোমলোগ বোলতে নেহী, কওন মুক্তি হ্যায়। আর কউন নেহী। ইস লিয়ে তোমলোগ সব গাদ্দার হ্যাঁয়।

সাধারণ মানুষেরা হচ্ছিল উভয় পক্ষের আক্রমণের শিকার। তাদের অবস্থা হয়েছে শিল পাটার অবস্থা। না পারছে কাউকে কিছু বোঝাতে, না পারছে কোন কিছু সইতে। মার খেতে খেতে গড়াতে থাকে দিনের পর দিন। এর মধ্যে একদিন সামিনার মেজভাই আজিজ এসে হাজির হল বাড়ী থেকে। আজিজকে দেখে সামিনার চাপা শোক আবার উথলে ওঠল।

ঃ মিয়া ভাইগো! আমাদের একি হল! কি অপরাধ আমরা করেছিলাম আল্লাহর কাছে! আজিজের গলা জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না সামিনার! আজিজের চোখও বাষ্পাচ্ছাদিত হয়ে যায়। নিজকে কোন মতে সম্বরণ করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে সামিনাকে।

ঃ কাঁদিস না, মিনা। এ আমাদের অদৃষ্ট। অদৃষ্টের ওপর তো কারো হাত নেই। ---- আমাদের বাপ ভাইকে যারা হত্যা করেছে তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি নাজিল হবেই একদিন, দেখে নিস।

আজিজ এসেই চেষ্টা করে অফিসের হাল হকিকত জানতে। অনেকদিন যাওয়া হচ্ছে না অফিসে। কে জানে চাকরী আছে কি না। বারবার রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে অফিসে যোগদান করার জন্য। আজিজ এতদিন আসতে পারেনি সুদূর উত্তর বঙ্গ থেকে। বহু দেরী হয়ে গেছে। সময়সীমা পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবুও আজিজ যায় অফিসের খবরাখবর নিতে মোকাররম সাহেবের বাসায়। আমবাগানের রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলিতে বিহারীরা এসে

আবার জড় হয়েছে। মোকাররম সাহেবের কলেজে পড়া দুই মেয়ে মেহের নিগার ও মেহের আফরোজ চাকরী নিয়েছে টি এন্ড টি অফিসে। আগে হিন্দু মেয়েরা ওসব পোষ্টে চাকরী করত। ওরা চলে যাওয়ার পর পদগুলি খালি হয়ে যাওয়ায় ওগুলিতে এখন বিহারী মেয়েরা ঢুকেছে। মোকাররম সাহেবদের খুশি দেখে কে! তাদের উপযুক্ত ছেলে মেয়েদের কেউ এখন আর বেকার নেই। সবাই বিভিন্ন প্রকারের কাজ কর্মে ঢুকে পড়েছে।

আজিজ ঘোরাফেরা করতে করতে মোকাররম সাহেবের বাসায় গিয়ে হাজির হতেই দেখতে পায়, মোকাররম সাহেবের ছেলেমেয়েদের কেউ ঘরে নেই। একমাত্র মোকাররম সাহেবের স্ত্রীই ঘরে আছে। মোকাররম সাহেবও অফিসে। মোকাররম সাহেবের স্ত্রী আজিজকে দেখে বললেন-

ঃ এতদিন পরে এসেছ, বাবা! তোমাদের দেশের বাড়ীর খবর কি?

আজিজ সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলে মোকাররম সাহেবের স্ত্রীকে। মোকাররম সাহেবের স্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ আফসোস করলেন শুনে।

ঃ আমাদের মধ্যেও অনেক পশু আছে, আজিজ মিয়া। সব মানুষ সমান নয়। আমাদের এদিকে তুমি একটু কম আস, বাবা। আর তোমার বাসার দিকেও যেওনা এখন।

আজিজ একটু বিস্মিত হয় মোকাররম সাহেবের স্ত্রীর কথা শুনে। সে ওখান থেকে বের হয়ে পানের দোকানে যায় যেখান থেকে তারা সব সময় পান খেত। আজো আছে সেই মামুর পানের দোকান। এই দোকানের খয়ের মাখা পান না খেলে আজিজের তৃপ্তি হত না। বিহারী দোকানদার সবার মামা। সবাই ডাকে তাকে মামু বলে। অনেক দূর থেকে অনেক লোক কার নিয়ে পর্যন্ত মামুর পানের দোকানে ছুটে আসে এক খিলি খয়ের মাখা আজিমিরী জর্দার পানের জন্য। আজিজ যায় আজো মামুর দোকানে। আজিজকে দেখে বৃদ্ধ দোকানদার মামু জিজ্ঞেস করেন,

ঃ কি আজিজ মিয়া! কেমন আছ? বাড়ী থেকে কবে আসলা?

ঃ কয়েকদিন হল, মামু। আপনারা কেমন, ভাল আছেন তো?

ঃ এই কোন রকম আর কি। নাও, পান খাও। ওঠেছ কোথায়?

আজিজ পান নেয় বুড়া দোকানদার থেকে। পান খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে আশপাশের সবার কথা।

ঃ ওঠেছি আমার বোনের বাড়ীতে। আচ্ছা, মামু, মোকাররম সাহেবের স্ত্রী চাচী আমাকে আমার বাসার দিকে যেতে নিষেধ করলেন কেন। আমি কি আমার বাসার খবরাখবর নেব না। অনেক দিন ছিলাম না। কি অবস্থায় আছে না আছে কে জানে।

ঃ না, বেটা। তিনি ঠিকই বলেছেন। না যাওয়াই ভাল।

ঃ কিন্তু কেন, মামু! আমার ঘরবাড়ী কেমন আছে না আছে আমি দেখব না!

ঃ দেখা উচিত। কিন্তু এখন সে অবস্থা নেই।

ঃ কি বলছেন, মামু?

ঃ হ্যাঁ, বেটা, ঠিকই বলছি। দেখছ না। কোন বাঙ্গালী এখন এদিকে নেই। কাছে ডেকে কানে কানে মামু ওকথা বলতেই আজিজ চমকে ওঠে। তাইতো। আজিজ তো এসব এতক্ষণ খেয়াল করেনি।

ঃ আজিজ মিয়া, তুমি তোমার বোনের বাসাতেই চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পার ততই বেহেতের।

মামুর কাছ থেকে আরেকটি পান নিয়ে আজিজ পেছন ফিরতেই দেখতে পায় দুটা বিহারী ছেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আজিজ চিনতে পারে না ছেলে দুটিকে। ছেলে একটি বলে ওঠে-

ঃ আরে আজিজ ভাই যে! আপনি কোথেকে। বহুদিন পর এদিকে আসলেন মনে হয়।

ঃ কিন্তু আপনারা?

ঃ চিনতে পারছেন না, এই তো।

ঃ পারবেন, পারবেন। চলুন আপনার বাসার দিকে। আমরাও যাব ওদিকে।

বৃদ্ধ পানের দোকানদার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দেখল ছেলে দুটির কান্ড। তারপর অনুনয়ের সুরেই যেন বলল-

ঃ ইসকো কাঁহা লে যা রাহা তোম লোগ। ছোড় দো।

ঃ কাঁহি নেহী, মামু। উনসে কুচ বাত চিত করনা হ্যায়। উন কা ঘর লেযা রাহা হোঁ।

একরূপ জোরজবরদস্তি যেন ছেলে দুটি ধরে নিয়ে গেল আজিজকে। আজিজও অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ওদের সঙ্গে যেতে বাধ্য হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

এদিকে সারা দুপুর আজিজের বাসায় ফেরার নামগন্ধ নেই দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে সামিনা। সেই সকালে চা নাস্তা করে বেরিয়েছে। বলে গেছে মোকাররম সাহেবের বাসার দিকে যাবে। অথচ দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্য মধ্য আকাশে থেকে তীব্র তাপ বিকিরণ করে ধরিত্রীতল উত্তপ্ত করতে করতে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তবুও আজিজ ফেরে না। তালগোল পাকিয়ে যায় সামিনার চিন্তায়। মিয়া ভাই গেল কোথায়? মোকাররম সাহেবের বাসাতেই কি তাহলে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করেছে! নাকি এতদিন পরে বাড়ী থেকে এসেছে, তাই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মিয়া ভাই যা আড্ডাবাজ মানুষ! দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। তীব্র রোদ ফিকে হয়ে যায়। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আঁখিকে নিয়ে সামিনা। আঁখি বিরক্ত করছিল দেখে তাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে তার নিজের চোখের পাতাগুলিও যে কখন বুজে গিয়েছিল তা সে নিজেও টের পায়নি। মসজিদ থেকে, আসরের আজানের ধ্বনি কানে আসতেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়মড় করে ওঠেই দেখে বিকেল হয়ে গেছে। আঁখি তখনো ঘুমে। সামিনা তাড়াতাড়ি অজু করে আসরের নামাজ পড়ে মুনাজাত করতে গিয়ে দেখে আঁখিও জেগে ওঠে বিছানায় বসে আছে। সামিনা জায়নামাজ তুলে কাপড় পাল্টে তাড়াতাড়ি গিয়ে কোলে তুলে নেয় আঁখিকে।

ঃ আম্মু! আমার লক্ষী আম্মু! আমার সোনা আম্মু!

আঁখিও সামিনার গলা জড়িয়ে মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চুপ করে থাকে। সামিনা আঁখিকে নিয়ে গিয়ে পেশাব করিয়ে দুধ খাওয়ায়। সন্ধ্যার পর রাত্রেও যখন আজিজ ফিরে না আসে তখন শংকিত না হয়ে আর পারে না সামিনা।

ঃ কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা। মিয়া ভাই তো এখনো বাসায় ফিরল না। কোন অঘটন ঘটেনি তো!

ঃ কি অঘটন ঘটবে! হয়ত দেরী হচ্ছে। আসবে।

কিন্তু রাত্রেও ফিরে আসল না আজিজ। সকালে আর স্থির থাকতে পারে না সাবিনা। পীড়াপীড়ি শুরু করে রাহাতকে।

ঃ তুমি একটু খবরাখবর নাওনা। কোথায় গেল মিয়া ভাই।

সম্ভাব্য সব জায়গায় খবরাখবর নিল রাহাত। কোথাও আজিজ নেই। মোকাররম সাহেবের বাসায় গিয়েছিল। ওখান থেকে বের হয়ে কোথায় গেছে কেউ জানে না। রাহাতকেও পেয়ে বসে এবার নানারকম দুশ্চিন্তায়। আম বাগানের দিককার যেসব ছিটেফোঁটা খবরাখবর রাহাত পেয়েছে তাতে সত্যি সত্যিই এবার রাহাত ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ে।

তের

অফিস থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত লোকজন যাদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ছিল আজিজের, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করল রাহাত। কেউ কোন খবর দিতে পারল না আজিজের। সবার মুখে এক উত্তর। না, দেখেনি। কেউ কেউ আবার বলল, বাড়ী থেকে কবে এসেছে আজিজ তাও তারা জানে না। এক বিশৃঙ্খল দুশ্চিন্তার ঝড় এলোমেলো করে দেয় রাহাতের চিন্তার পৃথিবী। কি করবে, কোন দিকে যাবে কিছুই স্থির করতে পারে না। দেশের বাড়ীতে রাণী ভাবীর কাছে চিঠি লিখে রাহাত। উত্তর আসে একটাই। না, সেখানেও যায়নি। এখন কি করবে, কোন দিকে অগ্রসর হবে? কিছুই ভেবে চিন্তে কূল কিনারা করতে পারে না রাহাত। দিন যায় রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। কালস্রোত বয়ে চলে দুর্বার গতিতে। তবুও কোন প্রকার খবর পায় না রাহাতরা আজিজের।

ঃ মরতে কেন যে চিটাগাং আসল মিয়া ভাই!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সামিনা। সবাই নিশ্চিত হয়ে যায় যে আজিজ আর বেঁচে নেই। মাসুদা খাতুন বলেন-

ঃ যার মরণ যেখানে, নাও বেয়ে যায় সেখানে। প্রবাদটা তো মিথ্যা নয় মা।

ঃ কেন এমন হল, চাচী! আমাদের ভাগ্যটা কেন এমন হল! কি অপরাধ আমরা আল্লাহ্‌র কাছে করেছিলাম! বাপ গেল। ছোট মিয়া ভাই গেল। মেজ মিয়া ভাই খবরাখবর নিয়ে এল বাড়ী থেকে। এখানে এসে তাকেও যেতে হল একই পথে। কত সহ্য করব। কত সহ্য করব আর, চাচী। আল্লাহ্‌র বিচার কি এই।

মাসুদা খাতুনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে সামিনা। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলেন হাজীপত্নী-

ঃ নারে মা, আল্লাহ্‌র দোষ দিও না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বড় কিছু নিহিত রয়েছে যা আমাদের তোমাদের মত মানুষের চোখে ধরা পড়ছে না। আল্লাহ্‌র অসীমত্বকে আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে বোঝা বড় মুশকিল, মা, বড় মুশকিল। ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর।

ঃ এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়ছ কেন? হয়ত কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কোথাও গেছে। একদিন দেখবে যে জলজ্যান্ত মানুষটা এসে আবার হাজির। নানাভাবে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে রাহাত সামিনাকে।

ঃ কেন আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছ? আম বাগানের মেজ মিয়া ভাইদের বাসার ওদিকে বিহারীরা যা করছে বলে খবর পাচ্ছি তার মধ্যে মেজ মিয়া ভাইকে নিশ্চয়ই তারা মেরে ফেলেছে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কথা কটি বললেও দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যায় সামিনার যে, আজিজের বেচেঁ থাকার আশা করাটা বাতুলতা বই আর কিছুই নয়। ওদিকে কিন্তু এর মধ্যে রাণী ভাবী মা হয়ে গেছে এক কন্যা সন্তানের। প্রসব বেদনা ভুলে গিয়ে এক সময় সদ্যোজাত শিশু মেয়েটির মুখের দিকে চাইতেই রাণী ভাবীর বুক দুমড়ে বেরিয়ে আসে এক উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। দুচোখ থেকে নেমে আসে কান্নার নিস্তব্ধ অশ্রুধারা।

ঃ আসলি তো আসলি, অভাগী, শেষ পর্যন্ত এতিম হয়েই আসলি পৃথিবীতে।

ঃ এমন কি বলছেন আপনি, ভাবী! এতিম হবে কেন! নিশ্চয়ই মেজ মিয়া ভাই বেঁচে আছে। রাহাত ভাই তো খোঁজ করছেন ওঁর।

ছোট ভাবী সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে মেজ ভাবীকে। লিলিও তাই বলে। ছোট ভাবীর বোন লিলি। এমন কি ছোট ভাবীর বাপের বাড়ীর সবার ধারণা, আজিজের কিছুই হয় নি। আজো বেঁচে আছে আজিজ। বড় ভাবী ছবি চিঠি লিখেন রাণী ভাবীর কাছে ঢাকা থেকে। তাতেও একই আশ্বাস-

ভাবছিস কেন রাণী। আজিজের কিছুই হয়নি। আজিজ একদিন ফিরে যাবে তোর কাছে দেখে নিস। আমার কি মনে হয় জানিস, রাণী। আজিজকে মোকাররম সাহেবই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আজিজকে তিনি ছেলের মতই ভালবাসেন। কোন মতেই তার ক্ষতি হতে দেবেন না। অন্যান্য বিহারীদের দৃষ্টির আড়ালে হয়ত কোথাও লুকিয়ে রেখে পরবর্তীতে মিনার বাসায় পাঠিয়ে দেবেন। --- আরেকটি কথা, তোর মেয়ের নাম ঊর্মি রাখিস। উত্তাল তরঙ্গায়িত বিশ্ব সমুদ্রে ঊর্মি হয়ে যেন সে মাথা উঁচু করে থাকতে পারে চিরদিন। সমুদ্রের অতল তলে যেন তলিয়ে না যায়। আমি দোয়া করছি। একদিন ও মানুষের মত মানুষ হবে।

ছবি ভাবীর সান্ত্বনা পত্রে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকলেও মনোমূলে অনুভূত হয় না দৃঢ়তার ভিত্তি। সামিনার মন কোন মতেই সাড়া দেয় না যে, অভাগী মেয়েটি কোনদিন ওর বাপকে দেখবে। দেখবে, ওর বাপও ওর মাসুম চেহারা। মেজ মিয়া ভাই নিশ্চয়ই বলী হয়েছে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার। যদিও কিছুর মধ্যেই ছিল না মেজ মিয়া ভাই। নিরীহ নিরপরাধ বলে পরিচিত যে মানুষটি, তাকেও কি তাহলে মরতে হল একমাত্র বাঙ্গালী হওয়ার অপরাধে! আজিজের কাছে শুনেছে সামিনা-

ঃ তোরা জানিস না, মিনা। আমাদের বাঙ্গালীরা যা করেছে কোন মানুষ মানুষের সঙ্গে তা করতে পারে না। বিহারীদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটতরাজ তো করেছেই, এমন কি মেয়েদের ইজ্জতও নষ্ট করেছে অনেকে। মোকাররম সাহেবের মেয়ে নিগারকে তো ওরা রাস্তা থেকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে পেয়েছে। তাও অনেক চেষ্টা তদবীরের পর।

তাই বলে পাইকারী হারে সব বাঙ্গালীর ওপর কেন এই প্রতিশোধ? নিরীহ নিরপরাধ মানুষরা কেন বলী হবে কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কর্মের জন্য? প্রকৃত দুষ্কৃতিকারীরা তো আর ঘরে বসে নেই। সবাই পালিয়ে চলে গেছে ইন্ডিয়াতে। কোন কিছুই উপলব্ধির আওতায় আসে না সামিনার। ভেবে পায় না সামিনা। অতীত ভাস্বর হয়ে ওঠে সামিনার চোখের সামনে।

সামিনাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল আজিজ মোকাররম সাহেবের বাসায়। সে কি আনন্দ মোকাররম সাহেবের মেয়েদের! নিগার ও আফরোজ রেলের বিহারী কলোনীর প্রায় অনেকগুলি ঘরেই বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল সামিনাকে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সামিনাকে।

ঃ আজিজ ভাইয়ের বোন। আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছে। চিটাগাং এর ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। ষোলশহরের ওদিকেই বাড়ী।

সেকি হৃদ্যতা! সেকি আতিথেয়তা! মোকাররম সাহেবের স্ত্রী বলেন-

ঃ এই শহরেই তুমি থাক। অথচ আমাদের এদিকে আস না। যখন সময় পাবে, চলে এস, মা। তুমি আমাদের আরেক মেয়ে। তোমার মা তো এখানে নেই। আমি আছি। আমার কাছেই আসবে।

মাতৃত্বের আরেক জ্যোতিষ্ক যেন মোকাররম সাহেবের স্ত্রী। তাঁর মেয়েরাও যেন সামিনার এক একটি বোন। ওরা যখন সামিনাকে নিয়ে রেলের বিহারী পরিবারগুলিতে বেড়াতে গিয়েছিল, সামিনার পরিচয় দিতে গিয়ে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিল যেন মেয়েগুলো। ভাবটি যেন তাদেরই এক বোনের চিটাগাং এর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তারা গর্বিত। বিহারী পরিবারের মানুষদের সবাই আজিজের অন্তরঙ্গ। সামিনা তার বোন। তাই তারও সমাদর সবার কাছে।

ঃ আরে, আজিজ সাহেব তো আমাদের আপন জন।

সবার বক্তব্য একই। সামিনারও খুব ভাল লেগেছে তাদের সঙ্গে মিশে। বাঙ্গালী বিহারী বলে কোন পার্থক্য নেই। সবাই যেন একই সমাজের লোক। একই মহল্লার বাসিন্দা। একই বাজার থেকে বাজার করে। একই চালের ভাত খায়। যদিও কেউ কেউ রুটিও খায়। একই মসজিদে নামাজ পড়ে। একই

গোরস্থানে মৃতের দাফন করে। হরষে বিষাদে আনন্দে বেদনায় সকল মানুষের অনুভূতি তো একই। গায়ের রঙও প্রায় একই রকম। রক্তের বর্ণের মধ্যেও নেই কোন পার্থক্য। শুধু পার্থক্য কেউ বাংলাভাষী, কেই উর্দূভাষী। আবার কেউ কেউ উভয় ভাষাতেই কথা বলতে পারদর্শী সমানভাবে। কেন তাহলে এই পার্থক্য মানুষে মানুষে! সাতচল্লিশ আটচল্লিশ সাল থেকে একই সাথে বসবাস করে, একই অফিস আদালত, মিল ফ্যাক্টরী, কলকারখানায় কাজ কর্ম করে কেন তারা পরস্পরের প্রতি মারমুখো হল। কেন একপক্ষ হল অন্য পক্ষের চোখের বালি! ....

বুঝে ওঠতে পারে না সামিনা। কোন কিছুই বুঝে ওঠতে পারে না। সব কিছুই কেন যেন ওর কাছে হেঁয়ালী হেঁয়ালী ঠেকে।

চৌদ্দ

আজকাল সন্ধ্যা হতে না হতেই চতুর্দিক কেমন যেন এক মড়া বাড়ীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কলকোলাহল ও কর্মব্যস্ততার স্রোত থমকে যায় চলচ্ছক্তিহীনতার আবর্তে। মানুষ জটলা পাকায় রেডিও ট্রানজিসটারের আশে পাশে নিত্য নতুন খবরাখবর শোনার জন্য। সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বি বি সি, ভোয়া, আকাশ বাণী ইত্যাদির খবর শোনার জন্য। দেশের অভ্যন্তরীণ রেডিও ষ্টেশনগুলির খবরে কোন বৈচিত্র্য নেই। শুধু শরণার্থীরা দলে দলে দেশে ফিরে আসছে। সর্বত্র বিরাজ করছে স্বাভাবিক অবস্থা। কল কারখানা চলছে পুরাদমে। দলে দলে আত্ম সমর্পণ করছে বিপথগামীরা।এসব ছাড়া নতুন কোন খবর নেই। চার ব্যাটারীর ন্যাশনাল ট্রানজিসটারটা খুলে খবর শুনতে যাবে, অমনি সময়ে আঁখির কান্নায় বিরক্তি ধরে যায় রাহাতের। মেয়েটিরও কান্নার যেন সময় নেই আর।

ঃ আঁখির আবার কি হল? কাঁদছে কেন?

ঃ তুমি একটু দেখনা। আমি তরকারীটা একটু জ্বাল দিয়ে আসছি।

চেঁচিয়ে রান্না ঘর থেকে উত্তর দেয় সামিনা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাটে শোয়া আঁখির কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় রাহাত। কান্না থামিয়ে পটল চেরা চোখ

মেলে তাকায় আঁখি রাহাতের দিকে। রাহাত আদর করে। মাসুম আঁখির নরম ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাহাতের বুক ভরে যায় আঁখির অনাবিল হাসির মায়ার পরশে। খানিক পরে রান্নাঘর থেকে আসে সামিনা। আঁখির দায়িত্ব সামিনাকে দিয়ে একখানা বেতের চেয়ার ও বেতের টেবিলটা নিয়ে রাহাত বেরিয়ে যায় উঠানে। সঙ্গে নিয়ে যায় ট্রানজিসটারটাও।

ঃ রাহাত ভাই, ও রাহাত ভাই!

ডাকতে ডাকতে সে সময় হাজির হয় রাহাতদের পাড়ারই রাহাতের বাল্যবন্ধু ইসমাইল। কন্ট্রাকটারী করে বিভিন্ন জায়গায়। অসহযোগের সময় কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে সেই যে বাড়ী এসে ওঠেছে আর যাওয়ার নাম গন্ধ নেই। এদিকে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নাকি আর যাবে না। বাড়ীর আশেপাশে ছোট ভাইবোনদের নিয়ে রকমারী শাকসব্জীর চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে প্রায় সময়। আজো বিয়ে যা করেনি। অথচ ছোট ভাই বিয়ে করে সন্তানের জনক হয়ে গেছে।

ঃ আমার বিয়ে! বলেন কি ভাবী! আপনার আঁখিই তো আমার শাশুড়ী।

সামিনা বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেই হেসে উড়িয়ে দেয় ইসমাইল। ভারিক্কীভাব নেই বললেই চলে মানুষটার। গম্ভীরতা তার ডিকশনারীতে অনুপস্থিত। সব কিছুতেই হালকা ভাব। কথাবার্তা চালচলন সব কিছুতেই চটুলতা। কাবু করতে পারে না কেউ ইসমাইলকে। সময় পেলেই সে ছুটে আসে রাহাতের এখানে। বেতের চেয়ার নিয়ে বসবে বাইরের আঙ্গিনায়। ফুঁকবে একের পর এক সিগারেট। আর আবদার করবে মাঝে মাঝে।

ঃ ভাবী, এই সঙ্গে কি একটুখানি চা হতে পারে না?

ঃ অবশ্যই পারে।

দুবন্ধুতে চলে তখন নানা গল্প। চায়ের কাপে চুমুকের সাথে সাথে ধূম পানও চলে কিন্তু পুরাদমে। মাঝে মাঝে তাদের সাথে এসে যোগ দেন হিরনের আব্বা আহসান সাহেব। রাহাতদের আরেক প্রতিবেশী। স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একা পড়ে আছেন ঘরবাড়ী পাহারা দেয়ার কাজে। তিনিও এসে মাঝে মাঝে যোগ দেন রাহাতদের আসরে সন্ধ্যার পর। আজ

কিন্তু আহসান সাহেব আসেন নি। রাহাত আর ইসমাইল শুধু রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দেশের খবর শুনছে মনোযোগ দিয়ে। ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনার পর হঠাৎ দিল্লীর আকাশ বাণী অন করতেই যুগপৎ চমকে ওঠে রাহাত ও ইসমাইল।

"জেনারেল রাও ফরমান আলীকা নাম পর জেনারেল মানিকশ কা ফরমান।

হাতিয়ার ঢাল দো। হামারে ফউজোঁ চারো তরফ সে ঘিরে হুয়ে হ্যাঁয়। খামকা খুন বহানেকি কোই জরুরত নেহী। আপলোগোঁ কে সাথ জেনেভা কনভেনশনকে মোতাবেক সুলুগ কিয়া জায়েগা।

কিছুক্ষণ পর পর বার বার প্রচারিত হচ্ছে ঘোষণাটি ভারতীয় আকাশ বাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্র থেকে। জিজ্ঞেস করে রাহাত-

ঃ ব্যাপার কি? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা। রাও ফরমান আলীকে বলবে কেন? রাও ফরমান আলী তো পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের সামরিক এটাচি। জি ও সি তো জেনারেল নিয়াজী।

ঃ না, না। কেন শোন নি। জেনারেল নিয়াজী রাও ফরমান আলীকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। আবার কেউ কেউ বলছে বার্মায় পালিয়ে গেছেন। গুজবের শেষ নেই। কোনটা সত্য কে জানে!

ইসমাইলের কথা শুনে ভাবতে থাকে রাহাত। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসছে। চতুর্দিকে জ্বলছে অসংখ্য বাতি। কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হয় সমস্ত ধরিত্রীটা অন্ধকার পুরীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কোন এক অজানা অনুভূতি যেন শির শির করে ঘুরে সর্বাঙ্গের প্রতি শিরা উপরিশরায়। কি হতে চলেছে কে জানে! মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক তো জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। তাহলে জেনারেল মানিকশ-এর নাম আসছে কেন? হতে পারে মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তো জেনারেল মানিকশ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে মুক্তি বাহিনী এত সহজে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী শহরগুলি দখল করে নিতে পারত না। সত্যিই কি মিত্র বাহিনী

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রাজধানীর দিকে। পিছু হটছে পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানী সেনা বাহিনী! স্থানীয় জনগণের সমর্থন পাচ্ছে না বলে তারা অসহায় হয়ে পড়ছে। ঢাকার পতন আসন্ন বলে মনে হয়। অনাগত অজানা ভবিষ্যৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলির ওপর। রাতের অন্ধকারের মত। সিন্দাবাদের দৈত্যের মত।

ঃ রাত তো কম হল না। খাওয়া দাওয়া করবে না?

সামিনার ডাকে সম্বিৎ যেন ফিরে আসে রাহাত ও ইসমাইলের। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলে ইসমাইল-

ঃ রাহাত ভাই, এবার উঠি।

ঃ আজকে আমাদের সঙ্গে চাট্টিখানি খেয়ে যান না, ইসমাইল ভাই।

ঃ খাব খাব, ভাবী। আগে আমার শাশুড়ী বড় হোক। ওর হাতের রান্নাই খাব।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ওঠে দাঁড়ায় ইসমাইল। একটা শেষ হতে না হতেই আরেকটা ধরায়। বক মার্কা সিগারেট না হলে নাকি নেশা কাটে না। রাহাত কিন্তু বক মার্কা সিগারেট তেমন টানতে পারে না। সে টানে ষ্টার সিগারেট। মাঝে মাঝে বিনিময়ও করে পরস্পরের মধ্যে। আজকাল কিন্তু কোনটাই পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে ভালভাবে। তাই অসুবিধায় পড়ে যায় ধূমপায়ীরা বড্ড বেশী। কবে যে এ অবস্থার অবসান ঘটবে কে জানে।

পরের দিন কিন্তু আবার আসে ইসমাইল সন্ধ্যার পর। আবার বসে রাহাতের সঙ্গে বেতের চেয়ার টেবিল নিয়ে বাইরের চত্বরে ট্রানজিসটার নিয়ে। একের পর এক কয়েকটা ষ্টেশনের খবর শোনার পর ঢাকার ষ্টেশন ধরে। করাচী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে শোনা যায়।

"কটি বিশেষ ব্যবস্থায় ভারতীয় বাহিনীকে ঢাকায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে।"

সমস্ত শরীর কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে রাহাতের। হিমশীতল অনুভূতিতে জমে যাচ্ছে রক্তকণিকাগুলি। সিগারেট ধরায় রাহাত। ধোঁয়া ছাড়ে জোরে জোরে টেনে। কিন্তু তবুও কেন যেন থামে না শরীরের কাঁপুনি।

ঃ আরে ঐ সিগারেটে গা গরম হবে না, রাহাত ভাই। এটা নাও। কড়ার দরকার।

বক মার্কা সিগারেট একটা এগিয়ে দেয় ইসমাইল রাহাতকে।

ঃ ভাবছ কি, খান সেনাদের দিন শেষ। আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি।

ঃ কিন্তু আমার এই রকম লাগছে কেন, ইসমাইল?

ঃ কি রকম লাগছে?

ঃ আমি বলতে পারব না।

ঃ আরে, আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি বলেই খুশীতে এই রকম লাগছে।

ঃ জানি না।

ঃ ভাবী, আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। আরেক কাপ গরম চা চাই।

ঃ দিচ্ছি, ভাই।

দুকাপ গরম চা তৈরি করে এনে দুই বন্ধুর হাতে দেয় সামিনা। চায়ের কাপে চুমুক দেয় আর পা দোলায় ইসমাইল। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের ধূমপানও চলে পুরাদমে। তার অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসে সামিনা। রাহাত কিন্তু কেমন চুপচাপ ও গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

ঃ এবার কিন্তু আপনাকে ছাড়ছিনা, ইসমাইল ভাই।

ঃ মানে!

ঃ বুঝলেন না!

ঃ না।

ঃ স্বাধীন বাংলায় প্রথম বিয়ে হবে আপনার।

ঃ ওহ্ হো। তাই-ই। হাঃ হাঃ হাঃ।

সশব্দ হাসিতে চারিদিক মুখর করে তোলে ইসমাইল। ওর অবস্থা দেখে রাহাত না হেসে আর পারে না। পরের দিন মিলে যায় রাহাত। কাজ কর্ম সব বন্ধ। মিলের অবাঙ্গালী অফিসাররা সব অদৃশ্য। বিহারী শ্রমিকদের কে কোথায়

গেছে কোন পাত্তা নেই। মিলের মালিক ম্যানেজমেন্ট কেউ নেই। অবাঙ্গালী মালিক নেই। শ্রমিক কর্মচারীরা কিসের ভরসায় কাজ কর্ম করবে! কে নেবে তাদের দায়িত্ব! কে দেবে তাদের বেতন মজুরী!

তাছাড়া আজকে কাজের দিন নয়। আজ তো আনন্দোল্লাসের দিন। আজ সর্বত্র কেমন যেন এক খুশীর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালীদের আজ ঈদ। পাকিস্তানীদের পরাজয় হয়েছে। বাঙ্গালীরা আজ বিজয়ী। পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে আজ পাকিস্তানের নব্বই হাজার পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে মিত্র বাহিনীর ভারতীয় জেনারেল জগজিৎসিং আরোরর কাছে ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে। আজ বাঙ্গালীদের আনন্দ দেখে কে! তারা আজ স্বাধীন। তাইতো মানুষ নেমে পড়েছে রাস্তায়। আজ সর্বত্র মানুষের ঢল। কেউ ঘরে নেই।

ইসমাইল ও রাহাতও হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসের দিকে। জলপাই রঙের ইউনিফর্মধারী ভারতীয় ফৌজে ভরা সার্কিট হাউজ। রাহাতরা সেখানেই জানতে পারে যে, ভারতীয় সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে বিহারী কলোনীগুলি। অবাঙ্গালী অফিসার ও অভিজাত লোকদের সেনা ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে প্রহরায় রেখেছে। তবুও বহু অবাঙ্গালী ও পাকিস্তানপন্থী লোকদেরকে মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা মেরে নালা নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। রাহাতরা দেখেছে ইতস্ততঃ বহু মৃতদেহ।

ঃ আজকে কি মানুষ খুন করা উচিত হচ্ছে? আজকে তো বাঙ্গালীদের ধৈর্য ধারণের দিন।

মেহেদীবাগ এলাকায় পথ চলতে গিয়ে জনৈক বৃদ্ধ পথচারীর মন্তব্যে তার দিকে ফিরে তাকায় ইসমাইল ও রাহাত। ইসমাইল বলে-

ঃ এরকম কিছু কিছু হবে, চাচা মিয়া। এরকম কিছুকিছু হবে।

ঃ কেন, বাবা? শেখ সাহেব তো বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাংলা ভাষাভাষীরাও বাঙ্গালী। তাদের ওপর যেন কোন প্রকার জুলুম না হয়। তাতে আমাদের বদনাম হবে।

ঃ নেতারা অনেক কিছু বলেন যা সব সময় মানা হয় না।

ঃ কি জানি, বাপু!

মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা রাইফেল উঁচিয়ে উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রাকে করে করে বন্দর নগরীর রাস্তায় রাস্তায়। বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত লাল বৃত্ত বুকে নিয়ে পতপত করে ওড়ছে সবুজ পতাকা। বিজয়োল্লাসে মাতোয়ারা সমগ্র দেশ। এদিক থেকে ওদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে জনতার খন্ড খন্ড দল। ফিরে আসে রাহাত বাসায়। আঁখিকে কোলে তুলে নেয়। আঁখি ড্যাবড্যাবে চোখ দুটি মেলে চেয়ে থাকে রাহাতের মুখের দিকে। সে চাউনিতে যেন অগুণতি বোবা প্রশ্ন!